মাসিক

আলোকধারা

তাসাওউফ বিষয়ে বহুমুখী গবেষণা ও বিশ্লেষণমূলক জার্নাল

রেজিঃ নং চ-২৭২, ৩২ তম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল ২০২৬ ঈসায়ী

১৭ জানুয়ারি ২০২৬: মাইজভাণ্ডার শাহী ময়দানে গাউসিয়া হক মন্‌জিল কর্তৃক আয়োজিত 'তাজকেরা-এ চেরাগে উম্মতে আহমদী (দ.) মাহফিল'-এ বক্তব্য প্রদান করছেন জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া কামিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ অধ্যক্ষ আলহাজ মাওলানা কাযী আবদুল আলীম রেজভী।

২৩ ডিসেম্বর ২০২৫: গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী ও ১২০তম মহান ১০ই মাঘ উরস শরিফ উপলক্ষে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব সাঈদ মোহাম্মদ ইব্রাহীম'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক সমন্বয় সভায় মুনাজাত পরিচালনা করছেন গাউসিয়া হক মন্‌জিলের সম্মানিত সাজ্জাদানশীন আওলাদে রাসুল (দ.) রাহ্‌বারে আলম হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (ম.)।

মহান ১০ই মাঘ উরস শরিফ উদ্‌যাপন

৬ মার্চ ২০২৬: থিয়েটার ইনস্টিটিউটে 'এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট' নিয়ন্ত্রণাধীন তারুণ্যনির্ভর যুব সংগঠন 'তাজকিয়া' কর্তৃক আয়োজিত 'তারুণ্যের বাস্তব ভাবনায় মাহে রমাদান' শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন তাজকিয়ার প্রধান উপদেষ্টা প্রকৌশলী আবু নাসের নুর অন্তু।

চট্টগ্রাম জমিয়তুল ফালাহ্ মসজিদে ১৫ রমযান থেকে শেষ রমযান পর্যন্ত ইফতার ও সাহ্‌রীর আয়োজনের জন্য মসজিদ কমপ্লেক্স উন্নয়ন ও মুসল্লি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ খোরশেদুল আলম-এর হাতে চেক হস্তান্তর করছেন 'এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট'র প্রশাসনিক ও সমন্বয় কর্মকর্তা মোহাম্মদ তানভীর হোসাইন।

মাসিক

আলোকধারা

THE ALOKDHARA
A MONTHLY JOURNAL OF TASAWWUF STUDIES
রেজি. নং চ ২৭২, ৩২তম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

এপ্রিল ২০২৬ ঈসায়ী
শাওয়াল-জিলকদ্ ১৪৪৭ হিজরী
চৈত্র-বৈশাখ ১৪৩২-১৪৩৩ বাংলা

প্রকাশক :
গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর পবিত্র রক্ত ও ত্বরিকতের উত্তরাধিকার সূত্রে এবং অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী প্রদত্ত দলিলমূলে, গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর রওজা শরিফের খেদমতের হকদার, তাঁর স্মৃতি বিজড়িত অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের হকদার, শাহী ময়দান ব্যবস্থাপনার হকদার– মাইজভাণ্ডার শরিফ গাউসিয়া হক মন্জিলের সাজ্জাদানশীন
সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান

সম্পাদক :
অধ্যাপক জহুর উল আলম

যোগাযোগ :
০১৭৫১ ৭৪০১০৬
০১৩১০ ৭৯৩৩৩২

মূল্য : ২৫ টাকা $=২

সম্পাদকীয় যোগাযোগ:
দি আলোকধারা প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স
সৈয়দ সলিমুল্লাহ্ শাহ্ রোড, বিবিরহাট
পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম-৪২১১।
ফোন: ০১৮৭২২৮৮৬৫৫

এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট-এর পক্ষে
মাইজভাণ্ডারী একাডেমি প্রকাশনা
www.szhtrust.org
E-mail:sufialokdhara@gmail.com

সূচি

- সম্পাদকীয় ---------- ২
- **শায়খুল আকবর হযরত মুহিউদ্দিন ইবনে আরাবী (রহ.)'র ব্যাখ্যায় সূরা আল-ইনশিরাহ্'র মর্মার্থ**
  আবুল ওয়াসিফ জামান ---------- ৩
- **সাহাবায়ে কেরামের (রা.) তাসাওউফ জগৎ হযরত আবু বকর (রা.) : জীবনটাই যাঁর পরিপূর্ণ তাসাওউফ**
  অধ্যাপক জহুর উল আলম ---------- ৫
- **মাইজভাণ্ডার দরবার : এক অবারিত ঐশী জলসাঘর**
  নুরুল মোজতবা ---------- ৯
- **শান্তির অন্বেষণ : ইসলামী নিরিখ**
  মুহাম্মদ ওহীদুল আলম ----------১১
- **"দেখে যারে মাইজভাণ্ডারে হইতেছে নূরের খেলা নূরী মাওলা বসাইল প্রেমের মেলা"**
  হাসনাত হাসান রাহাত ---------- ১৩
- **হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ আমিরুজ্জমান শাহ্ (ক.)**
  মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন শিবলু ---------- ১৭
- **হযরত বাচা ফকির (ফতেপুর), বাচা বাবা (রাঙ্গুনিয়া) এবং সৈয়দ আবদুল আজিজ খিতাপচরী (রহ.)**
  অ্যাডভোকেট আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইকবাল ---------- ২১
- **নৈতিকতা, রাজনীতি এবং ইসলাম : একটি সমীক্ষা**
  জাবেদ বিন আলম ---------- ২৬
- **উদার পন্থার নৈতিক সমাজ বিনির্মাণে উলামায়ে কেরামের ভূমিকা**
  মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল কাদের ছাকিব আল কাদেরী -----৩১
- **"মাযহাবে ইশ্‌ক আয্ হামে দ্বীনহা যুদাস্ত আশেকাঁরা মাযহাব ও মিল্লাতে খোদাস্ত"**
  আল কোরআনের আয়াত ঘনিষ্ঠ আল্লামা রুমীর কালামের ব্যাখ্যা
  মাওলানা মোহাম্মদ মিনহাজ উদ্দিন ---------- ৩৩
- **অলিকুল শিরোমনি হযরত এয়াছিন শাহ্ (র.) ও তাঁর দরবারের আধ্যাত্মিক মহিমা**
  ইবনুল আহমদ ---------- ৩৭
- **মানবসৃষ্টির মূল ঐশীপ্রেম**
  মোহাম্মদ সাজীদুল হাসান চৌধুরী ---------- ৪১
- **বেলায়তের অবিনশ্বর আলোকধারা গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)**
  শাহজাদা সৈয়দ ফয়জুল আবেদীন আরমান ফরহাদাবাদী ----- ৪৫
- **হযরত ইব্রাহিম (আ.)'র স্বপ্ন: হযরত ইসমাঈল (আ.)'র কোরবানি: ইবনুয-যবীহায়েন হযরত মুহাম্মদ (দ.) এবং শোহাদায়ে কারবালার মর্যাদাপূর্ণ আত্মদান প্রসঙ্গ**
  মুহাম্মদ আমিরুল ইসলাম রিয়াজ ---------- ৪৬
- **বাই'আতের আলোকে মুরিদ-মুর্শিদ সম্পর্ক**
  উম্মে হাবিবা (তানিয়া) ---------- ৪৮
- **তাযকেরাতুল আউলিয়া'র লেখক সুফি কবি ফরিদ উদ্দিন আত্তার (রহ.)**
  মোঃ আকিব---------- ৫১
- **আয়না-এ-হিন্দ আঁখি সিরাজ (রহ.) এর জীবন ও কর্ম**
  মিনহাজুল আলম ---------- ৫৬
- **প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সুফি ভাবধারা**
  মুহাম্মদ জিয়াউল হাসান ---------- ৫৯
- **আত্ম পরিচয় দর্শন: অলি, দার্শনিক এবং কবির বাণীতে ঐক্যের ঝংকার**
  মোহাম্মদ আরমান উদ্দীন ---------- ৬২
- **তাযকিয়া-এ-নফ্‌স'র পরিপূর্ণ রূপ : নফ্‌সে জাকিয়া**
  শেখ বিবি কাউছার ---------- ৬৩

সম্পাদকীয়

সমস্ত প্রশংসা মহামহিম আল্লাহ্‌র। বেশুমার দরুদ ও সালাম বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ (দ.)'র প্রতি। অশেষ শ্রদ্ধা ও সালাম আহলে বাইতে রাসুল, সাহাবায়ে কেরাম, গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী সহ তামাম আউলিয়ায়ে কেরাম, ফকিহ্, মনীষীদের প্রতি।

এবার আলোকধারার প্রচ্ছদ হয়েছে খানায়ে কাবার ছবি দিয়ে পবিত্র হজ এবং কোরবানীকে সামনে রেখে। পবিত্র কাবাকে ঘিরে হাজীদের নিনাদ 'লাব্বায়েক! আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক! লা–শরীকা লাকা লাব্বায়েক, ইন্নাল হামদা ওয়ান্ নি'মাতা লাকা ওয়াল মুল্‌ক লা শরীকা লাব্বায়েক।' –এ যেন আল্লাহ্ প্রেমিকদের অবিনাশী তূর্য্য। এ তূর্য্যের বদৌলতে আল্লাহ্ আমাদের অন্তরকে ঐশী প্রেমের জলসা ঘরে পরিণত করুণ। এটাই হজ উপলক্ষে আমাদের প্রার্থনা।

আলোকধারা এপ্রিল ২০২৬ সংখ্যা প্রকাশিত হলো। এ সংখ্যায় আমরা পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি গাউসুল আযম বিল বিরাসত হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ গোলামুর রহমান বাবা ভাণ্ডারী কেবলা আলমকে। তাঁর স্মরণে আয়োজিত উরস শরিফে লক্ষ লক্ষ আশেক ভক্তের সমাগমে অহরহ আল্লাহ্‌র জিকিরে জিকিরে প্রাণবন্ত হয়ে থাকে মাইজভাণ্ডার শরিফ। লক্ষ লক্ষ ভক্তের আহাজারি এবং আত্মরোদনে বেজে উঠে এক অবিমিশ্র সুর, "মানুষ ধরার কল বসাইছে আমার বাবা ভাণ্ডারী, সে কলেতে পরলে ধরা তার থাকে না ঘর বাড়ি।" এ যেন ঐশী নিনাদে একাত্ম হবার লক্ষ্যে সকল প্রকার পার্থিবতা ছেড়ে বিচ্ছেদ-বিরহ বেদনা নিয়ে অগণিত ভক্ত-আশেকের ঐকতান। খোদা প্রেমিকের এ ধরনের মহামিলনে অসংখ্য সুরেলা কণ্ঠে ধ্বনিত হয়, "গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী ভবে আসিলে; জুমলা আলম থর থরায় যার নাম শুনিলে।" এ যেন এক অভিন্ন-অবিচ্ছেদ্য রেখায় মানবসাম্য, ঐক্য-সংহতির অভেদ নীতি প্রতিষ্ঠার তাগিদে পৃথিবীর বুকে ত্বরিকায়ে মাইজভাণ্ডারীয়ার উদ্ভব ঘটেছে এর প্রচার ও প্রসার সাধনই হচ্ছে আয়োজিত উরস সমূহের মৌলিক কাজ। আমরা ২২ চৈত্রের এই উরসের দিনে মহামহিম আল্লাহ্‌র কাছে বিশ্ববাসীর কল্যাণ কামনা করি। আমরা পৃথিবীজুড়ে চলমান যুদ্ধ, দ্বন্দ্ব, সংঘাত, মানব হত্যা এবং সম্পদ ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা থেকে মুক্তি চাই। আমরা কখনো চাইনা, "যখন আপনার প্রতিপালক ফেরেশ্‌তাদের বললেন, 'আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে যাচ্ছি' তখন তারা (ফেরেশ্‌তারা) বলল, 'আপনি কি এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যারা সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও খুনখারাবি সৃষ্টি করবে?' –(সূরা বাক্বারা : ৩০)। মালায়েক জগতের এ ধরনের আশংঙ্কার প্রতিফলন পৃথিবীতে না ঘটুক– ২২ চৈত্র উপলক্ষে এই ফরিয়াদ রেখে আমরা আল্লাহ্‌র দরবারে সকলের কল্যাণ কামনা করি।

১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন সরকার গঠিত হয়েছে। জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত এই সরকারকে আমরা অভিনন্দন জানাই এবং দেশ ও জনগণের স্বার্থে কল্যাণময় কাজ করার তাওফিক প্রদানের জন্যে আল্লাহ্‌র দরবারে রহমত কামনা করি। ৫ আগস্ট ২০২৪ ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মুখে পূর্ববর্তী সরকারের বিদায় ঘটলে গঠিত ইন্টেরিম সরকার দেশে স্থিতিশীলতা এবং আইনের যথাযথ প্রয়োগ ঘটাতে ব্যর্থ হয়। ফলে দেশজুড়ে অধিকারের নামে শুরু হয় নৈরাজ্য, মব উৎপাত। যা গণপ্রত্যাশাকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ উগ্র বার্তা শুধু রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক প্রতিহিংসাকে বেগবান করেনি বরং ধর্মীয় মতবাদিক ভিন্নতাকেও নির্মম পন্থায় বিনাশের পথ উস্‌কিয়ে দিয়েছে। সে সময়ে বাংলার জমিনে শায়িত অসংখ্য আউলিয়া-পীর-ফকিরের মাজার ভাঙা এ ধরনের নমুনা। মাজার ভাঙার এবং লুটপাটের যাবতীয় ঘটনা ঘটেছে পবিত্র জুমা'র দিন শুক্রবার নামায শেষে। যাঁরা এসব কাজে উস্কানি দিয়ে চলেছেন তারা এ ভূখণ্ডে ইসলাম প্রচারের সঠিক ইতিহাস অবহিত আছেন কিনা সন্দেহ। বাংলা ভূখণ্ডে যখন ইসলাম প্রচার শুরু হয় তখন এখানে মসজিদ-মাদ্‌রাসা গড়ে উঠেনি। বরং অসংখ্য তাঁবু, আস্তানা-খানকাহ্ থেকেই ধর্ম প্রচার শুরু করেছিলেন পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে আগত দরবেশ, অলি-বুজুর্গরা। যে সকল নির্মোহ, নির্লোভ সংসার বিরাগী পার্থিব স্বার্থবিমুখ মহান ব্যক্তিরা আত্মীয় পরিজন এবং জন্মভূমি ত্যাগ করে বাংলা ভূখণ্ডে এসে আল্লাহ্‌র একত্ববাদের দাওয়াত দিয়েছেন– দেখা যাচ্ছে এ ধরনের ব্যক্তিত্বের মিশনারী কেন্দ্রগুলো যা– অলি-দরবেশদের স্মৃতি চিহ্ন হিসেবে সুপরিচিত তা মুছে দেয়ার তৎপরতা চলেছে নির্ভয়ে। চলমান পরিস্থিতিতে পরমত অসহিষ্ণুতা এবং ভিন্ন মতের প্রতি অশ্রদ্ধা পোষণকারীদের বিষয়ে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করে সর্বত্র সহিষ্ণু পরিবেশ বজায় রাখা বাংলাদেশে নতুন সরকারের কাছে সময়ের দাবি। এমনকি ভিন্ন মতের কারণে কবর থেকে লাশ উত্তোলন করে পুড়িয়ে ফেলে মহান আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে উশৃঙ্খল নগ্ননৃত্যে মাতোয়ারা হওয়া কখনো ধর্ম নয়। ইসলাম ধর্মে ইজতিহাদের ধারায় ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়ে মতভিন্নতা অমূলক নয়। তবে মতভিন্নতা নিয়ে ঝগড়া, ফ্যাসাদ, মারামারি কখনো প্রত্যাশিতও নয়। অথচ ধর্ম বিষয়ে ফিত্‌না-ফ্যাসাদ রক্তারক্তিকেই আমাদের একশ্রেণির লোক ধর্ম বলে বিশ্বাস করে থাকে। সকল ধর্ম বিশ্বাসের মূল এবং অবিসংবাদিত কেন্দ্র অভিন্ন অদৃশ্য সত্তা এক আল্লাহ্। আল কোরআন, ইঞ্জিল, তাওরাত, যবুর সহ যাবতীয় ধর্মগ্রন্থ এই অবিনশ্বর সত্তার দাওয়াতই প্রদান করেছে। পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্‌র পয়গাম প্রচারকের মহত্তম দল হিসেবে পরিচিত আউলিয়ায়ে কেরাম এ দাওয়াতই জনসাধারণের মধ্যে পৌঁছিয়ে থাকেন। বাংলাদেশে তাদের আস্তানা, খানকাহ্, দরগাহ্ ঘিরে এখনো সাধারণ মানুষ সেই দাওয়াতের প্রত্যাশায় ঘুরে বেড়ায়।

বর্তমান সরকারের পূর্বসূরীরা ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে রাষ্ট্র ক্ষমতা পরিচালনা করেছেন। এ সময়ে একশ্রেণির ধর্মীয় উগ্রবাদীদের মাধ্যমে দরগাহ-মাজারে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেছে। ঐ বৈরী অভিজ্ঞতা বর্তমান সরকারের রয়েছে। তাই কোন অবস্থায় যেন ধর্মসহ কোন ক্ষেত্রে উগ্রপন্থার আবির্ভাব ঘটতে না পারে এ লক্ষ্যে এখন থেকে অতি সতর্ক নজরদারি এবং কঠিন আইনী পদক্ষেপ জারি রাখা দেশের জন্য অত্যাবশ্যক বলে আমাদের বিশ্বাস। আমরা বিশ্বাস করি ধর্ম বিশ্বাস এবং আচরণ যার যার– রাষ্ট্র সবার, এই আলোকে বর্তমান সরকার সর্বাবস্থায় সতর্ক পদক্ষেপ গ্রহণ করে সকলের জন্যে শান্তি সুখময় কর্মমুখর একটি দেশ গঠনের প্রত্যয় বজায় রাখবে। মহান আল্লাহ্ তাদের সেই তাওফিক এনায়েত করুন। আল্লাহ্ আমাদের সকলের কল্যাণ করুন।

শায়খুল আকবর হযরত মুহিউদ্দিন ইবনে আরাবী (রহ.)'র ব্যাখ্যায় সূরা আল-ইনশিরাহ্'র মর্মার্থ

♦ আবুল ওয়াসিফ জামান ♦

পবিত্র কোরআনের ৯৪ নং সূচিভুক্ত সূরা হচ্ছে আল-ইনশিরাহ্। এই সূরা 'আল-শরহ' নামেও পরিচিত। সূরা আদ-দোহা বিষয়ে ইবনে আরাবী যেখানে আত্মার "আলো ও আড়াল" -এর সম্পর্ক উন্মোচন করেছেন, সেখানে ইনশিরাহ্ আত্মার 'প্রসারণ' বা 'উন্মুক্ততা'র বিষয় প্রকাশ করে। মুহিউদ্দিন ইবনে আরাবী (রহ.)'র মতে এই সূরার প্রতিটি আয়াত আত্মার রহস্যোদ্ঘাটনের প্রতীক। মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রিয়তম হাবীবের (দ.) অন্তরে এমন বিশালত্ব সৃষ্টি করেছেন, যাতে সেখানে পরম সত্যবাণী 'ওহী'র পরিপূর্ণ প্রতিফলন ঘটতে পারে। বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ (দ.)'র বক্ষ প্রসারণের ঘটনাটি তাঁর পার্থিব জীবনে সংঘটিত অসংখ্য মু'যিজার মধ্যে অন্যতম একটি। পৃথিবীতে চিকিৎসা বিজ্ঞান তখনও মানব হৃদপিণ্ডে অস্ত্রোপচারের মতো উন্নত পর্যায়ে উপনীত হয়নি। আশ্চর্যের বিষয় মাত্র চার বৎসর বয়সকালে অতি শৈশবে ধাত্রীমাতা হযরত হালিমার (রা.) গৃহে অবস্থানকালে দুধ ভ্রাতাদের সঙ্গে জঙ্গলে বকরি চরানোকালে শ্বেত ভূষণধারী দু'ব্যক্তি হযরত মুহাম্মদ (দ.)'র বক্ষে অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করেন। অস্ত্রোপচারকারী এই দু'ব্যক্তিকে হুজুর (দ.) নিজে যেমন প্রত্যক্ষ করেছেন, তেমনি উপস্থিত তাঁর দুধ ভ্রাতারাও চর্ম চক্ষে দেখেছেন। মানব আকৃতিধারী দুজনই ছিলেন পরম সম্মানিত ফেরেশ্তা হযরত জিবরাঈল (আ.) ও হযরত মিকাঈল (আ.)। হযরত (দ.)'র বক্ষ প্রসারণ সর্বমোট চারবার সম্পন্ন হয়েছে বলে সীরাত রচনাকারীদের অভিমত। প্রথমবার হযরত হালিমা সাদিয়া'র তত্ত্বাবধানে অবস্থানকালে। দ্বিতীয়বার হযরত আবু হুরায়রা (রা.)'র বর্ণনায় সহীহ ইবনে হিব্বান, দালাইলে আবু নুয়াইম প্রমুখ রাবীর সঠিক উদ্ধৃতি অনুযায়ী ১০ বছর বয়সে। তৃতীয়বার 'মুসনাদে আবু দাউদ তায়ালিসী' পৃষ্ঠা ২১৫ এবং 'দালাইলে আবু নুয়াইম' প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৯-এ উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)'র বর্ণনা অনুযায়ী নবুয়ত প্রকাশের পূর্বে বক্ষ প্রসারণ সম্পন্ন হয়। চতুর্থবার সত্যের সৈনিক হযরত আবু যার গিফারী (রা.)'র বর্ণনায় সহীহ্ বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈতে উদ্ধৃত হয়েছে মিরাজের সময় বক্ষ প্রসারণ সুসম্পন্ন হয়। বক্ষ প্রসারণ সম্পর্কিত তথ্য নিজস্ব বুদ্ধি বিবেচনা অনুযায়ী ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নেয়া উচিত নয়। সাহাবায়ে কেরামের মতে অনেকে হুজুর (দ.)'র পবিত্র বক্ষে অস্ত্রোপচারের সেলাই চিহ্ন দেখেছেন। মাত্র চার বৎসর বয়সে পবিত্র বক্ষে অস্ত্রোপচারের অর্থ হচ্ছে কৃলবে পাপ প্রবণতা লেশ মাত্র না থাকা সত্ত্বেও যেন কোন অবস্থায় তা পবিত্র অন্তরকে স্পর্শ করতে না পারে, এ জন্যে জন্যে আল্লাহ্র তরফ থেকে উপর্যুক্ত শৈল্যকার্য সম্পন্ন হয়। হুজুর (দ.)'র পবিত্র বক্ষ উন্মোচনের পর তা সেলাই করার পূর্বে সুশীতল বরফ দিয়ে ধুয়ে ফেলা হয়। এ কাজটিও সম্পন্ন করেন করেন মহিমান্বিত ফেরেশ্তাদ্বয়। এ বিষয়ে শায়খুল আকবর হযরত মুহিউদ্দিন ইবনে আরাবী (রহ.) তাঁর 'ফুতুহাত' কিতাবে লিখেছেন, পাপের মূলকে নিভিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে বরফ ব্যবহার করা হয়েছে যাতে পাপরূপী উত্তাপের নাম-নিশানাও না থাকে। কারণ পাপের প্রকৃতি গরম।

বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ (দ.)'র পবিত্র বক্ষ প্রসারণ কারো কারো অভিমত অনুযায়ী 'বক্ষ বিদারণ' সম্পর্কে সূরা আল-ইনশিরাহ'র আয়াত সমূহের সাধারণ অনুবাদ হচ্ছে; ১. আমি কি আপনার হৃদয় প্রশস্ত করে দেই নি? ২. আমি আপনার ওপর থেকে দুর্বহ বোঝার ভার অপসারণ করিনি? ৩. যার ভার ছিল আপনার জন্যে অতিশয় কষ্টদায়ক। ৪. আমি আপনার স্তুতিবাক্য তথা মর্যাদাকে সমুন্নত করেছি। ৫. মনে রাখবেন, প্রতিটি কষ্টের সাথেই রয়েছে স্বস্তি। ৬. নিঃসন্দেহে প্রতিটি কষ্টের সাথে রয়েছে স্বস্তি। (অর্থাৎ প্রতিটি সমস্যার ভেতরেই রয়েছে তার সমাধান, প্রতিটি সমস্যার ভেতরেই রয়েছে তার সমাধান, প্রতিটি সমস্যার ভেতরেই রয়েছে নতুন সম্ভাবনা।) ৭. অতএব আপনি দৃঢ়তার সাথে কাজ করুন। ৮. আর যখনই সময় পান আপনার পালনকর্তার প্রতি একান্তভাবে নিমগ্ন হোন।

উপর্যুক্ত অনুবাদ সাধারণ অর্থবোধক এবং হুজুর (দ.)'র প্রতি মহান আল্লাহ্র একান্ত মমতার বহিঃপ্রকাশ। সূরা আল-ইনশিরাহ'র মাধ্যমে ভূমিষ্ঠ হবার পূর্ব থেকে আল্লাহ্ তাঁর প্রিয়তম হাবীবের (দ.) প্রতি সর্বাধিক নজরদারির বিষয়টি প্রকাশ করেছেন। বিশ্ববিশ্রুত দার্শনিক এবং ইলমুল গায়েবের তত্ত্বপুরুষ হযরত মুহিউদ্দিন ইবনে আরাবী (রহ.)'র মতে এই সূরার প্রতিটি আয়াতে আত্মার রহস্যোদ্ঘাটনের বিষয় সংযুক্ত হয়েছে। আল্লাহ্ তাঁর প্রিয়তম নবির অন্তরে এমন এক বিশালতা সৃষ্টি করেছেন, যাতে সেখানে দিব্য সত্যের পরিপূর্ণ প্রতিফলন ঘটতে পারে। তাঁর মতে এ সূরার প্রথম আয়াত বক্ষ প্রসারণের রহস্য সম্পর্কিত। ইববে আরাবী বলেন, 'শরহ' মূলত বঙ্গানুবাদ হিসেবে প্রসারণ শব্দকে নির্দেশ করে। শায়খুল আকবর উল্লেখ করেন, 'শরহ' কেবল শারীরিক বক্ষের নয়, বরং সির্‌রুল কাওন-অস্তিত্বের গোপন কেন্দ্রের উন্মোচন। নবি (দ.)'র 'সদর' বা বক্ষ হল এমন একটি আয়না, যেখানে সমগ্র সৃষ্টির প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়। ফুতুহাতুল মক্কিয়া দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি লিখেছেন, "যখন আল্লাহ্ নবির বক্ষ উন্মুক্ত করলেন, তখন তাঁর

মধ্যে 'হাকিকাতুল মুহাম্মাদিয়া' সম্পূর্ণ প্রকাশ পেল। সেই হৃদয় তখন আসমান ও জমিনের ধারণক্ষম হলো।" অর্থাৎ প্রথম আয়াত এমন অবস্থাকে নির্দেশ করে যেখানে সেই পরম পবিত্র সৃষ্টির আত্মা আল্লাহ্‌র তাজাল্লির (দিব্য আলো) ধারক হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় আয়াত ভার মুক্তির আধ্যাত্মিকতা। 'ওয়িজর' শব্দটি সাধারণত পাপ বা ভার হিসেবে অনুবাদ হয়। তবে ইবনে আরাবী'র মতে নবির ক্ষেত্রে এটি কোন নৈতিক অপরাধ নয়, বরং আল-হামলুল কওন তথা সৃষ্টির ভার বহনের দায়িত্ব। ইবনে আরাবী উল্লেখ করেন, নবির হৃদয় যে সকল সত্তার হাল বহন করে, সেই ওয়জিরই তাঁর জন্যে দুঃখের উৎস ছিল; আল্লাহ্ সেই ভার পরম মমতায় নিজের দিকে ফিরিয়ে নিলেন।" অর্থাৎ নবির বক্ষে যখন আল্লাহ্‌র নূর প্রবাহিত হয়, তখন মানবজাতির দুঃখ ও বিচ্ছিন্নতার ভার তাঁর অন্তরে সঞ্চিত হয়। এই আয়াতে সেই ভার মুক্তির রহস্য নিহিত। আল্লাহ্ তাঁর প্রিয়জনের অন্তর থেকে জগতের বোঝা সরিয়ে দেন, যেন তিনি সম্পূর্ণভাবে একাগ্রচিত্তে তাঁর দিকে মনোনিবেশ করতে পারেন। তৃতীয় আয়াত হচ্ছে অস্তিত্বের ক্লান্তি ও দেহের প্রতীক। এই আয়াত নবির শারীরিক ও আত্মিক কষ্টের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হলেও ইবনে আরাবী একে দেখেছেন 'অস্তিত্বের ভার' -এর প্রতিচ্ছবি হিসেবে। তাঁর মতে, "আল্লাহ্‌র নৈকট্য যতোই বৃদ্ধি পায়, ততোই সত্তা নিজের সীমাবদ্ধতা অনুভব করে।" অর্থাৎ আত্মা যখন আল্লাহ্‌র দিকে যাত্রা শুরু করে, তখন সে নিজের সত্তার সীমা ও দুর্বলতার ভারে ন্যুজ হয় এই 'ওয়িজর' সেই মানবিক ক্লান্তির প্রতীক। আল্লাহ্ তাঁর প্রিয়তমকে সেই সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত করেন, যেন তিনি চির উন্মুক্ততার আলোকময় অবস্থায় স্থিত হন। চতুর্থ আয়াতে রয়েছে নাম ও সত্তার উত্থান। ইবনে আরাবী উল্লেখ করেন, নবি (দ.)'র নামের উচ্চারণ কেবল মানব জিহ্বায় নয়, বরং কসমিক স্তরে। নবির 'যিকির' উত্থাপিত হয়েছে যেহেতু নবির পবিত্র সত্তা আল্লাহ্‌র সত্তার প্রতিফলন। ফুসুসুল হিকাম, হিকমাতু মুহাম্মাদিয়া অংশে ইবনে আরাবী উল্লেখ করেছেন, "যে মুহূর্তে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" উচ্চারিত হয়, সেই মুহূর্তেই "মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্" ধ্বনিত হয়। কারণ একটিকে অন্যটি ছাড়া কল্পনা করা যায় না।" এই আয়াতের ম্যাধমে ইবনে আরাবী নবির নামকে "দিব্য পরিচয়"-এর প্রতীক হিসেবে দেখিয়েছেন– তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্ নিজের সৌন্দর্য প্রকাশ করেন। পঞ্চম আয়াতে কঠিনতার সঙ্গে সহজতার রহস্য স্পষ্ট করা হয়েছে। ইবনে আরাবীর মতে, এই আয়াতে আত্মার অস্তিত্বগত দ্বৈততার ঘোষণা রয়েছে। এক দিকে "উসর" (কঠিনতা) হলো গায়েবের পর্দা, আর "ইয়াসর" (সহজতা) হলো তাজল্লির মুহূর্ত। শায়খুল আকবর বলেন, যে কঠিনতা আপনি অনুভব করুন, সেটিই আপনাকে সহজতার দিকে নিয়ে যায়; কারণ আল্লাহ্ তাঁর প্রতিটি আড়ালেই নিজের প্রকাশ্যের দরজা রাখেন।" অর্থাৎ কঠিনতা ও সহজতা একে অপরের বিপরীত নয়। বরং পারস্পরিক প্রতিফলন। আত্মা যখন কষ্টে নিমজ্জিত হয়, তখন সেই কষ্টই তাকে আল্লাহ্‌র নৈকট্যের পথ দেখায়। ষষ্ঠ আয়াতে রয়েছে ধ্যান ও নিবেদনের আহ্বান। ইবনে আরাবী উল্লেখ করেন, ফারাগতা অর্থাৎ ফাঁকা হওয়া মানে বাহ্যিক কাজ শেষ হওয়া নয়, বরং আত্মাকে যাবতীয় পার্থিব চিন্তা থেকে মুক্ত রাখা। "ফানসাব"– দাঁড়িয়ে পড়ো, নিজের অস্তিত্বকে আল্লাহ্‌র পথে স্থাপন করো। শায়খুল আকবর লিখেছেন, "যখন আত্মা জগতের কাজ থেকে অবসর নেয়, তখন তার একমাত্র কর্তব্য আল্লাহ্‌র প্রতি মনোযোগী হওয়া।"

সূরা ইনশিরাহ্ শেষ হয়েছে এক অভ্রান্ত অনন্ত বাণীতে; অন্তরের সুগভীর আহ্বান 'তাওহিদ'–এ যেন অসীমের প্রতি সসীমের বিনম্র সমর্পণ। কর্মদিবসের অবসরে আত্মা যেন শুধু আল্লাহ্‌র দিকেই অনুগত থাকে। কারণ মহান আল্লাহ্ই পরম প্রশান্তির একক কেন্দ্রবিন্দু।

শায়খ মুহিউদ্দিন ইবনে আরাবী (রহ.)'র মতে, সূরা ইনশিরাহ্ আত্মার আধ্যাত্মিক উন্মুক্ততার মানচিত্র। এই সূরা শিখিয়ে দিয়েছে, আল্লাহ্ যখন কারো অন্তর উন্মুক্ত করেন, তখন সেই অন্তর সমগ্র মহাবিশ্বকে ধারণ করতে সক্ষম হয়। সূরার শুরু হয়েছে বক্ষপ্রসারণ বিষয় নিয়ে। সমাপ্ত হয়েছে প্রসারিত আত্মার অনন্ত অসীম সমীপে নিবেদনের পরম প্রশান্তির মধ্যে যা হচ্ছে, "ওয়ালা রাব্বিকা ফারগাব"। উল্লেখ্য, সূরা আদ্-দোহা ও ইনশিরাহ্ মিলিয়ে সরল পথের অভিযাত্রীদের জন্যে এক পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক আলোরেখা গঠন করে। আদ্-দোহা শেখায়– "আল্লাহ্ আছেন, যদিও আড়ালে" আর আল-ইনশিরাহ্ শেখায়– "আল্লাহ্ যখন প্রকাশিত হন, তখন অন্তরই হয় তাঁর আসন" "ওয়াসিয়া কুরসিয়ুস সামা ওয়াতি" হিসেবে আবির্ভূত হয়। সূরা আদ্-দোহা'র আধ্যাত্মিক গুরুত্ব উপলব্ধি করে 'বেলায়তে মোত্‌লাকা' গ্রন্থের একাদশ পরিচ্ছেদ, 'লেওয়ায়ে, আহমদী' অধ্যায়ে "ওয়ালাল আখেরাতু খাইরুল লাকা মিনাল উলা" –(আদ্-দোহা : ৪) উল্লেখ করে মুর্দা দিল জিন্দা করার তাগিদ প্রদান করা হয়েছে। "নিঃসন্দেহে আপনার পূর্ববর্তী সময়ের চেয়ে পরবর্তী সময় অনেক ভালো"– এ যেন কষ্টের ভিতর চির প্রশান্তির অমৃত আহ্বান। এতো চিরন্তন সত্তার প্রশংসিত ঝাণ্ডা 'লেওয়ায়ে আহমদী'র সামিয়ানায় সমবেত হবার ডাক।

তথ্যসূত্র:

১. ইবনে আরাবী, আল ফুতুহাতুল মক্কিয়া, ২য় খণ্ড।
২. ইবনে আরাবী, ফুসুসুল হিকাম, হিকমাতু মুহাম্মাদিয়াহ।
৩. ক্লোদ আদ্দাস, Quest for the Red Sulphur The Life of Ibn Arabi, Cambridge Islamic Texts Society, 1993.

সাহাবায়ে কেরামের (রা.) তাসাওউফ জগৎ
হযরত আবু বকর (রা.) : জীবনটাই যাঁর পরিপূর্ণ তাসাওউফ

♦ অধ্যাপক জহুর উল আলম ♦

(শেষ পর্ব)

উপর্যুক্ত তথ্যের আলোকে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)'র তাসাওউফ জগৎ সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)'র অবস্থান ও মর্যাদা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসুল কর্তৃক নির্ধারিত। তাঁর সম্পর্কে কোন নেতিবাচক উক্তি মহান আল্লাহ্র অপছন্দনীয়। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এবং উমর (রা.) সম্পর্কে কটুক্তিকারীদের বিষয়ে কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক বলে আমরা মনে করি। ইমাম মুস্তাগফেরী 'দালায়েলুন্নবুয়ত' গ্রন্থে "জনৈক নির্ভরযোগ্য রাবী বর্ণনা করেন, আমরা তিন ব্যক্তি ইয়েমেন সফরে বের হই। আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল কুফার অধিবাসী। এ ব্যক্তি হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) ও উমর (রা.) সম্পর্কে নেহায়েত অশালীন কথাবার্তা বলত। আমরা অনেক বুঝানো সত্ত্বেও সে বিরত হয়নি। ইয়ামনের নিকটে পৌঁছে আমরা এক জায়গায় অবস্থানের পর নিদ্রামগ্ন হয়ে পড়ি। প্রস্থানের সময় এসে পড়ায় আমরা ওযু করি এবং কুফার সে লোকটিকেও জাগ্রত করি। সে তখন বলল: আফসোস! এ মন্‌জিলে আমি তোমাদের পেছনে রয়ে গেছি। তোমরা আমাকে এমন সময় জাগালে যখন রাসুলুল্লাহ্ (দ.) আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে বলছিলেন: হে ফাসেক! আল্লাহ্ তা'আলা ফাসেককে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেন। এ সময়েই তোমার আকৃতি বদলে যাবে।' আমি কুফার সঙ্গীকে বললাম: ওঠ এবং ওযু কর। যখনই সে ওযু করতে বসে তখনই তার পায়ের অঙ্গুলিগুলো বিকৃত হতে শুরু করে। তার উভয় পা বানরের পায়ের অনুরূপ হয়ে যায়। এরপর হাঁটু পর্যন্ত বানরের মত হয়ে যায়। ক্রমে ক্রমে তার আপাদমস্তক বানরের আকার ধারণ করে। আমরা তাকে উটের গদির সাথে বেঁধে নিই এবং মন্‌জিলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। সূর্যাস্তের সময় আমরা এক জঙ্গলে পৌঁছি। সেখানে বানরের বসবাস ছিল। সে এগুলোকে দেখে নেহায়েত অস্থির হয়ে রশি ছিঁড়ে ফেলে এবং বানরদের সঙ্গে মিলিত হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর যখন সে আমাদের দিকে আসে, তখন তার সাথে আরও বানর ছিল। আমরা বললাম: সর্বনাশ হয়েছে! এখন সকল বানর তার বন্ধু হয়ে গেছে। এখন আমরা তার ব্যাপারে কি করব? সে এসে আমাদের কাছে বসে যায়। আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার চক্ষু দিয়ে দরদর করে অশ্রু ঝরতে থাকে। ঘণ্টা খানেক পর বানরগুলো ফিরে গেলে সেও ওগুলোর সাথে চলে যায়।"

ইমাম মুস্তাগফেরী হযরত আলী ইবনে যায়েদ (রা.) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন, "তিনি বলেন: হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়িব (রা.) আমাকে বলেন: কাউকে পাঠিয়ে অমুক ব্যক্তির অবস্থা জেনে নাও। আমি বললাম: আপনিই তার অবস্থা বর্ণনা করুন। তিনি বললেন: না, কাউকে পাঠাও। আমি একজনকে পাঠালাম। হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়িব বলেন: সেই লোকটি রাসুলুল্লাহ্ (দ.)'র কতিপয় সাহাবীকে গালিগালাজ করত। ফলে, তার মুখমণ্ডলে একটি ক্ষত সৃষ্টি হয়। এর ফলে এক পর্যায়ে এ ক্ষত তার সমস্ত চেহারাকে ঘিরে ফেলে এবং অবশেষে তাঁর মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায়। ইমাম মুস্তাগফেরী কোন নেক ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি থেকে আরো রেওয়ায়েত করে যে, কুফার এক ব্যক্তি হযরত আবু বকর ও উমর (রা.)-কে মন্দ বলত। সে আমাদের সঙ্গে এক সফরে রওয়ানা হয়। আমরা তাকে অনেক বুঝালাম। কিন্তু সে আমাদের উপদেশ কানে তোলেনি। অবশেষে আমরা তাকে বলে দেই: আমাদের কাছ থেকে দূর হয়ে যাও। অতঃপর সে আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করে চলে যায়। ফেরার পথে আমরা তার চাকরকে বলি; তোমার মনিবকে বল আমাদের সঙ্গে চলে আসুক। সে জানায়, আমার মনিব এক অদ্ভুত ও আশ্চর্যজনক ঘটনার শিকার হয়েছে। তার উভয় হাত শূকরের হাতের মতো হয়ে গেছে। আমরা তার কাছে গেলে সে নিজের হাত আস্তিন থেকে বের করে, যা শূকরের অনুরূপ ছিল। সে আমাদের সঙ্গে রওয়ানা হয়। চলতে চলতে আমরা এক জায়গায় পৌঁছি। সেখানে শূকরের একটা পাল ছিল। সে ঘোড়া থেকে নেমে শূকর হয়ে শূকরগুলোর সাথে মিলে যায়। এরপর আমরা তাকে আর চিনতে পারিনি। তার মালপত্র ও গোলাম কুফায় নিয়ে আসা হয়।

জনৈক গাজী থেকে বর্ণিত আছে, আমরা একদল লোকের সঙ্গে এক যুদ্ধে শরিক হই। আমাদের দলে তামীমের গোলামদের মধ্য থেকে আবু হাইয়ান নামক এক ব্যক্তি ছিল। সেও হযরত আবু বকর এবং উমর (রা.) কে গালি দিত। আমরা তাকে অনেক বুঝিয়েছি, কিন্তু কোন কথাই ফলপ্রসু হয়নি। আমরা তাকে

আমাদের মন্‌জিলের পথে অবস্থানরত একজন শাসকের কাছেও নিয়ে যাই। শাসক তাকে তার নিকট রেখে দিয়ে আমাদেরকে চলে যেতে বলে। আমরা তাই করি। কিছু সময় অতিবাহিত হবার পর দেখি সে আমাদের পিছনে পিছনে চলে আসছে। শাসক তাকে একটি ঘোড়া ও পোশাক দিয়েছে। এগুলো নিয়ে আমাদের নিকটে এসে সে পুনরায় গালি দিতে শুরু করে। এক পর্যায়ে সে আমাদের বলে হে আল্লাহ্‌র দুশমনরা! কি দেখছ? আমরা তাকে আমাদের সঙ্গ ছেড়ে দিতে বলি। অতঃপর সে পথের এক পার্শ্বে চলতে থাকে, আমরা অন্য পার্শ্ব দিয়ে এগুতে থাকি। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্যে সে হঠাৎ রাস্তা থেকে সরে এক জায়গায় বসে যায়। আমরা লক্ষ্য করি একদল মৌমাছি হঠাৎ এসে তার উপর চড়াও হয়। আমরা ফিরে আসি। মৌমাছিগুলো তার মুখের সমস্ত মাংস ছিন্ন করে নেয়, শুধু কংকাল বাকি রাখে। দৃশ্য দেখে আমরা চীৎকার করে বললাম: আবু হাইয়ানের কেউ কি আছে? যে তার পরিত্যক্ত মালামাল সামলাবে?

ইমাম মুস্তাগফেরী পূর্ববর্তীদের নিকট থেকে আরো একটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন। "তিনি বলেন: আমার এক পড়শী হযরত আবু বকর ও উমর (রা.)-কে মন্দ বলত। একদা আমি হযরত রাসুলে করিম (দ.)-কে স্বপ্নে দেখলাম। হযরত আবু বকর ডানে এবং হযরত উমর তাঁর বামে ছিলেন। আমি আরয করি: ইয়া রাসুলুল্লাহ্, আমার এক পড়শী এই বুযুর্গদ্বয়কে গালিগালাজ করে আমাকে কষ্ট দেয়। হুজুর (দ.) নির্দেশ দিলেন: তাকে কতল কর। সকাল হলে আমি তার অবস্থা দেখার জন্যে সেখানে গেলে তার গৃহ থেকে হৈ-হুল্লোড়ের শব্দ শুনতে পেলাম। আমি গৃহবাসীদের জিজ্ঞেস করলাম: এখানে কি হয়েছে? জানা গেল গত রাতে তার গৃহে ঢুকে কেউ তাকে হত্যা করেছে। (এটি স্বপ্ন বৃত্তান্ত– যা সত্যে পরিণত হয়েছে)।"

জনৈক বসরাবাসী অন্য এক ঘটনা বর্ণনায় উল্লেখ করেন: "আমি আমার ধন-সম্পদ আহওয়াজের সরদারের নিকট বিক্রয় করি। লোকেরা বলে, সে রাফেযী এবং হযরত আবু বকর এবং উমর (রা.)'র শানে অশোভন ভাষা ব্যবহার করে। বিক্রয় করা মালের মূল্য আদায়ের লক্ষ্যে আমাকে তার নিকট বার বার যেতে হয়। একদিন আমার উপস্থিতিতে সে উপর্যুক্ত বুযুর্গদ্বয়কে গালিগালাজ করতে থাকে। আমি তার নিকট থেকে নেহায়েত দুঃখিত ও মনঃক্ষুণ্ন হয়ে চলে আসি। এই মনোকষ্টের কারণে আমি সে রাতে ইফতার করিনি। স্বপ্নে হুজুর (দ.)-কে দেখতে পেয়ে বিনম্র ভাষায় আরয করি: ইয়া রাসুলুল্লাহ্ (দ.)! দেখুন ঐ ব্যক্তি হযরত আবু বকর ও উমর (রা.)'র শানে অশোভন বকাবকি করে। হুজুর (দ.) বলেন: তার কথাবার্তা তোমার ভালো লাগে না? আমি উত্তর দেই: হ্যাঁ ইয়া রাসুলুল্লাহ্ (দ.)। তিনি বললেন: যাও, তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাকে নিয়ে আসলে তিনি বলেন: একে ঘুম পাড়িয়ে দাও। আমি তাকে ঘুম পাড়িয়ে দেই। এরপর হুজুর (দ.) আমাদেরকে একটা ছুরি দিয়ে বলেন: একে হত্যা কর। আমি ইতস্তত করে বলি: হুজুর, একে মেরে ফেলব? আমি এমনিভাবে তিনবার কথাটি জিজ্ঞেস করি। কেননা কাউকে হত্যা করা আমার কাছে গুরুতর কাজ ছিল। হুজুর (দ.) তৃতীয়বার বলেন: একে মেরে ফেল। আমি তাকে হত্যা করলাম। (ঘটনাটি একটি স্বপ্ন বৃত্তান্ত)। সকাল হলে আমার এই দুর্বৃত্তের অবস্থা জানার আগ্রহ হয়। তার মহল্লায় পৌঁছে হট্টগোল শুনতে পাই। আমার জিজ্ঞাসার জবাবে লোকেরা বলে: কাল রাতে কেউ তাকে বিছানার মধ্যে খতম করে দিয়েছে। আমি তাদের বললাম: আল্লাহ্‌র কসম, রাসুল করিম (দ.)'র নির্দেশে আমি তাকে হত্যা করেছি। তার পুত্র সমস্ত বিবরণ শুনে আমাকে বলল: আপনি আপনার ধন সম্পদ নিয়ে যান এবং তাকে ছাড়েন। আমি তাকে দাফন করেছি এবং ধন সম্পদ নিয়ে সেখান থেকে চলে আসি।"

ইমাম মুস্তাগফেরী দালায়েলুন্নাবুয়তে জনৈক পূর্ববর্তী বুজুর্গের বয়ান উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন: আমি শৈশব থেকে এক ব্যক্তির শাগরেদ ছিলাম। সে আমাকে শিয়া মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট করত। তার কথাবার্তা শুনে আমি হযরত আবু বকর এবং উমর (রা.)-কে মন্দ বলতাম। এক রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম, কিয়ামত শুরু হয়ে গেছে। মানুষ হুজুর (দ.)'র দিকে ধাবমান। হঠাৎ আমার দৃষ্টি রাসুলুল্লাহ্ (দ.)'র উপর পতিত হয়। তিনি এক জায়গায় বিদ্যমান ছিলেন। তাঁর ডান দিকে দু'কেশ গুচ্ছ বিশিষ্ট এক বয়স্ক ব্যক্তি উপবিষ্ট ছিলেন এবং বাম দিকে অনুরূপ আরো এক ব্যক্তি উপবিষ্ট ছিলেন। মানুষ হুজুর (দ.)-কে আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসুলুল্লাহ্ বলছে। আমি তাঁর নিকটবর্তী হই। বুজুর্গদ্বয়ের মধ্যে একজন বলেন: ইয়া রাসুলুল্লাহ্! এই বক্তি আমাদের কাছে কি চায়? এতে হুজুর (দ.) আমাকে ধরতে চাইলেন। আমি জাগ্রত হয়ে গেলাম। তখনই আমার মাথা, দাঁড়ি ও ভ্রূর কেশ ঝরে পড়ে। চার মাস পর্যন্ত আমি এ অবস্থায় থাকি। একদিন আমার এক বন্ধু আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। সে আমাকে জিজ্ঞেস করে: তোমার এ কি অবস্থা? কোন চিকিৎসকই তোমার চিকিৎসা করতে পারছে না? আমার ধারণা হল, সে মনে করছে এটা কোন ইশ্‌ক ও

মহব্বতের ব্যাপার। আমি তাকে সত্যি ঘটনা বলে দিই। সে বলল: তুমি হুজুর (দ.)'র সামনে তওবা করলে না কেন? বোধ হয় তুমি জান না যে হুজুর (দ.)'র প্রতি যে সালাত ও সালাম প্রেরণ করা হয়, তা তাঁর খেদমতেই পৌঁছে। আমি সাথে সাথে পানি আনিয়ে ওযু করি। অতঃপর দু'রাকাত নামায আদায় করি। তারপর ফরিয়াদ করি, হে বিশ্ব প্রতিপালক! আমি তওবা করছি এবং হযরত আবু বকর ও উমর (রা.)'র শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী হচ্ছি। তওবা করার পর এক সপ্তাহ অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই আমার মাথা, দাঁড়ি ও ভ্রূতে চুল গজিয়ে উঠে।

আরও একজন পূর্ববর্তী বুযুর্গ উল্লেখ করেন: সিরিয়া সফরকালে আমি ফজরের নামায এক মসজিদে আদায় করি। নামায শেষে ইমাম হযরত আবু বকর (রা.) এবং উমর (রা.)-কে বদ দোয়া দিতে শুরু করে। পরের বছর যখন আমি পুনরায় সিরিয়া সফরে গমন করি, ঘটনাক্রমে তখন ফজরের নামায সেই মসজিদেই আদায় করতে হয়। তখন নামায আদায়ের পর ইমাম হযরত আবু বকর (রা.) ও উমর (রা.)'র শুভ কামনা করে মুনাজাত করেন। আমি নামাযীদেরকে বিষয়টি জিজ্ঞেস করলাম। জানতে চাইলাম গত বৎসর তো ইমাম সাহেব হযরত আবু বকর (রা.) এবং উমর (রা.)-কে বদ দোয়া দিয়েছিলেন, এখন বিপরীত কেন হলো? নামাযীরা বললেন, আপনি কি পূর্বের ইমামকে দেখতে চান? আমি সম্মতি দিলে তারা আমাকে একটি সরাইখানায় নিয়ে যায়। সেখানে একটি কুকুর বাধা ছিল। তার চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত ছিল। আমি কুকুরকে জিজ্ঞেস করলাম: তুমি কি সেই ইমাম, যে হযরত আবু বকর (রা.) ও উমর (রা.)-কে গালি দিতে। কুকুরটি মাথায় ইশারা করল– হ্যাঁ, আমি সেই ব্যক্তি।" এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য শাস্তি বিষয়ক ঘোষণা উল্লেখ করা প্রয়োজন। মহান আল্লাহ্ ঘোষণা দেন, "এর পরও তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে। তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমরা অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যেতে। তোমরা ভালোভাবেই জানো, তোমাদের মধ্যে যারা শনিবারে সীমালঙ্ঘন করেছিল, আমি তাদের বলেছিলাম, ধিকৃত বানর হও। এই ঘটনা তাদের সমসাময়িক ও পরবর্তীদের শিক্ষা গ্রহণের জন্যে দৃষ্টান্ত এবং আল্লাহ্‌ভীরুদের জন্যে উপদেশ স্বরূপ" –(সূরা বাক্বারা : ৬৪-৬৫)।

মাদায়েনে কিছুকাল অবস্থানকারী এক বুজুর্গ বর্ণনা করেন, আমি যখনই পারতাম, যে অমুক জায়গায় কারও মৃত্যু হয়েছে সেখানে গমন করে মৃতকে কাফন পরিয়ে দিতাম। একদিন এক ব্যক্তি এসে আমাকে জানায়: অমুক জায়গায় কুফা থেকে আগত কয়েক ব্যক্তি অবস্থান করছে। তাদের একজন মৃত্যুবরণ করেছে। তার কাফন ক্রয় করার মতো কোন লোক নেই। আমি তা জেনে এক ব্যক্তিকে কাফন কেনার জন্যে পাঠিয়ে সেখানে পৌঁছি। দেখলাম সে মৃত পড়ে রয়েছে এবং তার পেটে একটি ইট রাখা আছে। সে হঠাৎ জীবিত হয়ে বসে যায় এবং 'হায় আফসোস', 'হায় আফসোস' বলতে থাকে। আমি বললাম: তুমি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বল না কেন? সে জানায়: এই মুহূর্তে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলার ফায়দা কি? আমি সেই দলের একজন, যারা হযরত আবু বকর ও উমর (রা.)-কে গালি গালাজ করে। এখন মৃত্যুর পর ফেরেশ্‌তারা আমার স্থান দোযখে দেখিয়েছে। তারা আমাকে এমন সকল মানুষকে সতর্ক করতে ও শিখাতে উদ্বুদ্ধ করেছে যারা উপরোক্ত সাহাবীদ্বয়কে গালিগালাজ করে। আমি এসব কথা শুনে ফিরে এসে সঙ্গীদের তা অবহিত করি। তারা বলল এতোদিন শয়তান তার মুখ দিয়ে কথা বলেছে।"

ফতুহাতে মক্কীয়া গ্রন্থে শায়খুল আকবর হযরত মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী (রহ.) উল্লেখ করেছেন: আল্লাহ্‌ওয়ালাদের একটি দলকে রজবী বলা হয়। তাদের সংখ্যা অন্যূন ও অনধিক চল্লিশ হয়ে থাকে। তাদের সম্পর্কে খ্যাতি আছে যে, রজব মাসের প্রথম তারিখে এরা অত্যধিক ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। মনে হয় যেন তাদের উপর আকাশ ভেঙে পড়েছে। তখন তারা মোটেই নড়াচড়া করতে পারে না। তাদের হাত-পা সম্পূর্ণ অবশ হয়ে যায়। এমনকি তারা চোখও খুলতে পারে না। পয়লা রজবে তাদের এই অবস্থা হয়। এরপর দিনে দিনে এই বোঝা হালকা হতে থাকে। শাবানের প্রারম্ভে তারা একদম হালকা পাতলা হয়ে যায় এবং সকল প্রকার ওজন ও ভারীত্ব থেকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি লাভ করে। রজব মাসে তাদের অসংখ্য 'কাশ্‌ফ' তথা অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ঘটনা প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়। তাদের অন্তর স্বর্গীয় দ্যুতিতে উজ্জ্বল ও ভাস্বর থাকে। অদৃশ্যের অনেক রহস্য তাদের কাছে উন্মোচিত হয়ে যায়। শাবান মাসে এসব রহস্য ও ইঙ্গিত ছিনিয়ে নেয়া হয়। কিন্তু মাঝে মাঝে কতক হাল সারা বছর অব্যাহত থাকে। এ প্রসঙ্গে হযরত মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী বলেন: এই বুযুর্গগণের মধ্য থেকে একজনের সাথে আমার সাক্ষাত হয়েছে। রাফেযীদের হাল ও বাস্তব অবস্থা তাঁর দৃষ্টিতে উজ্জ্বল হয়ে ধরা দিত। রাফেযী লোকদেরকে তিনি শূকরের আকৃতিতে দেখতে পেতেন। মাঝে মাঝে কোন অজ্ঞাত ব্যক্তি তার কাছ দিয়ে গমন করলে সে যদি রাফেযী মযহাব অবলম্বী হয়, তবে তিনি তাকে শূকরের আকৃতিতে দেখে ডেকে নিতেন এবং তওবা ও আল্লাহ্‌র দিকে রুজু হতে বলতেন।

লোকটি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেত। যদি সে লোক খাঁটি মনে তওবা করে নিত, তবে রজবী বুযুর্গ তাকে মানব আকৃতিতে দেখতেন এবং তার তওবার সত্যায়ন করতেন। পক্ষান্তরে, খাঁটি মনে তওবা না করলে পূর্ববৎ শূকরের আকৃতিই দৃষ্টিগোচর হতো। তখন তিনি তার মিথ্যাবাদিতা সম্পর্কে তাকে অবহিত করে বলতেন; তুমি খাঁটি মনে তওবা করোনি।"

একদিন কিছু ব্যক্তি রাফেযী মযহাব পরিত্যাগ করে এই বুযুর্গের নিকট আগমন করে। রাফেযী মতবাদ কি, এ সম্পর্কে তাদের কোন ধারণা ছিল না। তারা শিয়া মতাবলম্বীও নয়। বরং কারও উদ্বুদ্ধকরণ ব্যতীত নিজেদের চিন্তা-ভাবনার সাহায্যে রাফেযী মতবাদ গ্রহণ করে নিয়েছিল। তারা হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.) সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করত। তারা জনৈক রজবী বুযুর্গের নিকট এলে তিনি তাদেরকে বের করে দিতে নির্দেশ দেন। তারা তাদেরকে বের করে দেওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে বুযুর্গ বলেন: আমি তোমাদেরকে শূকরের আকৃতিতে দেখতে পাচ্ছি। অতঃপর বলেন: রাফেযীদেরকে শূকরের আকৃতিতে দেখা, আমার এবং আল্লাহ্ তাআলার মধ্যে একটি রহস্য। তখন তারা অপ্রকাশ্যে তওবা করে নেয়। বুযুর্গ তখন বলেন: তোমরা এই মুহূর্তে তওবা করেছ। কেননা, এখন আমি তোমাদেরকে মানবাকৃতিতে দেখতে পাচ্ছি। বুযুর্গের অবস্থা এবং আত্মিক মর্যাদা পর্যবেক্ষণ দেখে আগন্তুকরা বিস্মিত হয় এবং পূর্ণরূপে রাফেযী মযহাব থেকে তওবা করে নেয়।" (উপর্যুক্ত তথ্যপঞ্জি আল্লামা আবদুর রহমান জামি (রহ.) রচিত এবং মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত মদিনা পাবলিকেশন্স, বাংলা বাজার ঢাকা ১১০০ থেকে প্রকাশিত শাওয়াহেদুন্-নবুওত গ্রন্থের ২০৫-২১০ পৃষ্ঠা হতে সংগৃহীত)। উপর্যুক্ত তথ্যপঞ্জি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে কারও প্রতি পরম শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসার প্রকাশ ঘটাতে গিয়ে কখনো কোন মহান মনীষীর প্রতি অশোভন শব্দ প্রয়োগ ও মন্দ ধারণা সীমালঙ্ঘনের আওতাভুক্ত হয়। এ ধরনের আচরণ কখনো বাঞ্ছিত নয়। এ কারণে মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকতের আকর গ্রন্থ বেলায়তে মোত্লাকায় সপ্ত পদ্ধতি নির্ধারণ করে ভক্ত-অনুগামীদের প্রতি সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ্ সম্পর্কে হযরত আবু বকর (রা.) উল্লেখ করেছেন,

আল-ইজজো আন দারকেল সদ্রাকুন ফহুয়া
সুবহানো মানলাম ইয়াজ আল্লিল খালকি
ইয়ায়হি সাবিলা ইলাবিল ইজ্জি আন্ মারিফাতিহি।

অর্থাৎ: তাঁকে জানা যায় না– এটি জানা হচ্ছে তাঁকে চরম জানা। চির পবিত্র সেই আল্লাহ্– তিনি তাঁর নিকট পৌঁছার কোন পথই তাঁর সৃষ্ট জীবের জন্য উন্মুক্ত রাখেননি; শুধু একটি পথই খোলা আছে, সেটি হচ্ছে তাঁকে জানা যায় না– এই ই জানার পথ। তাঁর এ বক্তব্য আহ্লে ওয়াহ্দাতেরই অভিমত। মানুষ হাজার বছরের হায়াত প্রাপ্ত হয়ে সুদীর্ঘ জীবনে অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিরলস সাধনায় আত্মনিয়োগের মাধ্যমে প্রত্যহ যে নিত্য নতুন জ্ঞান প্রাপ্ত হবে এবং যে সংবাদ প্রাপ্ত হবে যা ইতপূর্বে প্রাপ্ত হয়নি। এতে তার ধারণা হবে মহান আল্লাহ্র ইলম ও হিকমত তথা জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কোন সীমা-পরিসীমা নাই। এ বিষয়ে পরিচয় লাভ হচ্ছে, তাঁকে জানা যায় না– এটিই হচ্ছে জানার পথ। এ কারণে শেখ ফরিদ উদ্দীন আত্তার (রহ.) বলেছেন, "তোমা হতে ঊর্ধ্ব কোন সৃষ্টি নাই। তোমার বাইরে আর কোন প্রেমাস্পদও নাই। যেহেতু তুমি বুদ্ধি ও জ্ঞানের পরিধির অতীত। সেই কারণে তোমার কোন ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ সম্ভব নহে। আর না তোমার যথার্থ গুণকীর্তন করা যায়। তাওহিদে মুতলাক তথা নিঃশর্ত মহা একত্ববাদ বলতে যা বুঝায় উহার সবই তোমার মাঝে বিদ্যমান।" অর্থাৎ অসীম-অসীম সত্তা– এ পরিচয় জ্ঞাত হয়ে হযরত আবু বকর (রা.) সমর্পিত হয়ে ছিলেন পরম নৈকট্যের সিজদায়। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) রাসুলে পাক (দ.)'র অন্তরে আল্লাহ্র দিদার লাভ করেন। আর আদেশ-নিষেধের পরিচয় জ্ঞান হক তায়ালার পক্ষ হতে হযরত (দ.)'র অন্তর মোবারকে আসে। তখন রাসুলুল্লাহ্ (দ.)'র অন্তর মোবারক সিদ্দীকে আকবর (রা.)'র জন্যে আয়না হয়ে যায়। এই আয়নায় তিনি আল্লাহ্র দিদার লাভ করেন। (মাকতুবাতে দো সদী ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৪৯, মূল: মাখদুমে জা হাঁ হযরত শায়খ শারফুদ্দীন আহমাদ ইয়াহ্ইয়া মানেরী (রহ.), অনুবাদ: অধ্যাপক মীর হাসান আলী)। এ বিষয়ে মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার সুফি কবি সৈয়দ বজলুল করিম মন্দাকিনী (রহ.)'র ভাষায়, 'জ্ঞান চক্ষে হেরি গাহে কবি কুল, তোমারি মহিমা গান।' সকল ধ্যান-অনুধ্যানের পরম ও চরম সত্য প্রশস্তি, 'আল হামদু লিল্লাহ্।' এটাই হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)'র তাসাওউফের সারমর্ম।

মাইজভাণ্ডার দরবার : এক অবারিত ঐশী জলসাঘর

♦ নুরুল মোজতবা ♦

পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তে আবির্ভূত বেলায়ত সাম্রাজ্যের একশত বিশতম উরস উদ্‌যাপিত হয়েছে। তিনিই তিনি যিনি গাউসুল আযম জিলানীর আধ্যাত্মিক শরাফতের মর্যাদায় উপযুক্ত ভাই হওয়ার যোগ্যতা পেয়েছেন। তিনিই তিনি যাঁর পরিচয় প্রদানে প্রখ্যাত অলি-আল্লাহ্ মাওলানা সফিউল্লাহ (রহ.) বলেন– মিঞা চিন? কি চিন? ছয়শত বৎসরে এইরূপ অলি পৃথিবীতে আসেন নাই। তাঁর ওফাত বার্ষিকীর আলোকে তাঁর জীবনী শরিফ থেকে যৎকিঞ্চিত আলোচনার প্রয়াস চালাচ্ছি।

তিনি আল্লাহ্‌র রাসুল (দ.)-এর পবিত্র বংশোদ্ভূত– আহলে বাইত। তাঁর পূর্ব পুরুষ গৌড় নিবাসী কাজী হামিদ উদ্দিন গৌড়ে মহামারী দেখা যাওয়ার কারণে চট্টগ্রামের পটিয়ায় নিবাস স্থাপন করেন। তাঁর পুত্র সৈয়দ আবদুল কাদের ইমামত কার্যোপলক্ষে নিবাস স্থাপন করেন ফটিকছড়ির আজিমনগরে। তাঁর নাতি সৈয়দ তৈয়্যব উল্লাহ্‌র পুত্র মাওলানা সৈয়দ মতি উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডার গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। মাইজভাণ্ডার ছিল মগদের বিরুদ্ধে অভিযানকারী মুসলিম সৈনিকদের অস্ত্র সরবরাহ কেন্দ্র। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধেও মাইজভাণ্ডার দরবারের অবদান উল্লেখযোগ্য। প্রবাহিনী স্ফটিক জলের স্বচ্ছ প্রবাহ বহায় অত্র এলাকায়। অসংখ্য গাছ নিজেদের বিলিয়ে দিয়ে এলাকাটিকে ছায়াময় করে রাখে। সাধে চোখ যতটুকু যায় সোনালী পাকা পাকা ধান। প্রতি চারায় ২৪০টির উপরে ধান। পশু পাখির কলকাকলিতে মুখর। এমনই দৃশ্য মাইজভাণ্ডার গ্রামে সদা বিরাজমান।

মুত্তাকী সুফি পিতা সৈয়দ মতি উল্লাহ্। মাতা সৈয়দা খায়রুন্নেসার রেহেমে ভূলোকে আগমন করেন সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্। সময় ১লা মাঘ ১২৩৩ বাংলা, ১৮২৬ ইংরেজি, ১২৪৪ হিজরি যোহরের আগে। তাঁর পাক নামের মাহাত্ম্য ও রহস্য 'বেলায়তে মোত্লাকা' কিতাবে উল্লেখ করা আছে। মক্তবে পাঠের পর মাধ্যমিক সম্পন্ন করেন মাওলানা মুহাম্মদ শফির সান্নিধ্যে। ১২৬০ হিজরিতে তিনি গমন করেন কলিকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসায়। সেখানে ৮ বছরের মধ্যে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। হযরত ১২৬৯ হিজরিতে যশোরের কাজী নিয়োজিত হন। এর মধ্যে তিনি নিজেকে বেশিদিন রাখতে পারলেন না, তিনি যে পরম দয়ালু সত্তা! তারপর কলকাতার বুআলী মাদ্‌রাসায় অধ্যাপনা শুরু করেন। এভাবেই হযরতের দিন যাচ্ছিল। একদিন হযরত পাল্‌কিযোগে ওয়াজে গমন করছিলেন। যাত্রাপথে ছিল খাজা সৈয়দ আবু শাহমা মুহাম্মদ সালেহ লাহোরীর হুজুরা। তিনি গাউসুল আযম জিলানীর বংশধর। তাঁর হুজুরায় মুরিদ পরিবেষ্টিত অবস্থায় তিনি হযরতকে দেখলেন এবং দাওয়াত পাঠালেন। হযরত এলে উভয়ে কোলাকুলি করেন। তিনি হযরতকে তবর্‌রুক স্বরূপ বাবুর্চিখানার সকল খানা দিলে হযরত খেয়ে আরো চাইলেন। হযরত সালেহ লাহোরী কালাম করেন, "আমার বাবুর্চিখানায় আপনার জন্য যাহা সুরক্ষিত ছিল তাহা আনিত হয়েছে, আরো অধিক প্রয়োজনে আপনি স্বহস্তে পাকাইয়া খাইবেন। সচেতন পাঠক পাঠ মাত্রই এ ঘটনার তাৎপর্য উপলব্ধি করবেন।

তারপর অলৌকিকভাবে সাক্ষাতপ্রাপ্ত হন কুতুবুল আকতাব শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলোয়ার আলী পাকবাজ (রহ.)-এর। ইতোমধ্যে হযরত কেবলার ভাব-বিভোরতা ক্রমেই বাড়তে থাকে। তিনি বনে বাদাড়ে ঘুরে রেয়াজত করেননি, তিনি ঘরে বসেই রেয়াজত করেছেন। এভাবেই বেলায়তের সর্বোচ্চ মোকাম হযরতের করকমলে আসে। তারপর থেকে হযরতের অসংখ্য কারামত প্রকাশিত হতে থাকে। কারামত এখনো চলছে, ভবিষ্যতেও হবে। তিনি তো দয়ালদাতা। তাঁকে মানবকল্যাণ করতে হয়। জাতভেদে নয়। দরবারে হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান সব অভেদ। হযরত কেবলার স্বভাব-ধর্ম তাঁর জীবনী অধ্যয়নে জানা যাবে। হযরতের শারীরিক অবয়ব রাসুল (দ.)-এর সাথে সাদৃশ্যতা রাখে। ২৭ জিলক্বদ ১৩২৩ হিজরী, ১০ মাঘ ১২২৭ বাংলা, ২৩ জানুয়ারি ১৯০৬ সোমবার রাত ১.৩০ মিনিটে তাঁর বেসাল হয়। আল্লাহ্ তাঁর বরকত আমাদের উপর দান করুন।

এবার আসা যাক তাঁর দরবারে সামা মাহফিলের আলোচনায়। হযরত কেবলার জীবদ্দশায় শিক্ষার্থী, গায়ক, ভক্তকুল হযরতকে গান শোনাতেন। হযরত বারণ করতেন না বরং নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ করতেন। ফটিকছড়ির পাইন্দং নিবাসী মোহাম্মদ এসহাক নামীয় এক ব্যক্তি হযরতের দরবারে আসেন। হযরত তাঁকে বললেন, "মামু সাহেব 'বাশের ঘরে বাস করিয়া' গানটি গাওতো"। তখন মোহাম্মদ এসহাক সাহেবও গানটি তাল দিয়ে গাইতেন। এমনকি হযরতের ভ্রাতুষ্পুত্র মাওলানা সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেল (রহ.) বাদ্যসহকারে সামা মাহফিল করতেন। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী অনেকজনকে নির্দেশ দিতেন "আমার আমিন মিয়ার মজলিসে গিয়ে বস।" হযরত কেবলার সামা মাহফিল সম্পর্কে সম্মতি উপরের ঘটনা পাঠেই বোঝা যায়। এ ব্যাপারে ছিরিকোট শরিফের পেশোয়ারী হুজুরকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি হযরত কেবলার পক্ষে অভিমত প্রদান করেন। গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র দরবারে বিচিত্র রূপের মানুষের সমাগম ঘটে। এখানে হরেক রকম কাজ কারবার দৃশ্যমান হয়। জনমানবের রূপবৈচিত্র্যে দেখলে মনে হয় যেন, সমগ্র বিশ্ব এখানে উপস্থিত আছে। আল্লাহ্ আমাদেরকে দরবারের মাহাত্ম্য অনুধাবনের সামর্থ প্রদান করুন।

তথ্য বিভ্রাটের জন্য দুঃখ প্রকাশ এবং প্রকৃত তথ্য উপস্থাপন

- মাসিক আলোকধারা ১০ই মাঘ ১৪৩২ বাংলা, জানুয়ারি ২০২৬ ঈসায়ী সংখ্যায় ১২৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত রেজোয়ানা আরেফীন লিখিত 'তাসাওউফ জগতে নারী : একটি পর্যবেক্ষণ' নিবন্ধে গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র পরম সম্মানিত আম্মাজান সম্পর্কে প্রদত্ত তথ্যটি ভুল এবং অনির্ভরযোগ্য হওয়ায় আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। তথ্য সংযোজনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে স্বীয় অসমর্থতা লেখিকা নিজে স্বীকার করে নিয়ে দুঃখ প্রকাশ এবং ক্ষমা চেয়েছেন। একইভাবে আলোকধারা'র সম্পাদক হিসেবে আমি নিজেও পাঠক এবং সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী।

প্রকৃত তথ্য

হযরত খায়রুন্নেসা বিবি (রহ.) হলেন গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র পরম শ্রদ্ধেয় আম্মাজান। তিনি চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার মির্জাপুর নিবাসী প্রখ্যাত আউলিয়া হযরত সৈয়দ জয়নুল্লাহ্ মোমেন শাহ্ (রহ.)'র ভাতিজী। হযরত সৈয়দ জয়নুল্লাহ্ মোমেন শাহ্ (রহ.)-এর ভাই হযরত সৈয়দ সানাউল্লাহ্ মোমেন (রহ.) দ্বীন প্রচারের লক্ষ্যে ফটিকছড়ির ভূজপুর থানার অন্তর্গত হানাফিয়া গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। হযরত সৈয়দ সানাউল্লাহ্ মোমেন শাহ্ (রহ.)'র দু'কন্যার মধ্যে প্রথম কন্যা সৈয়দা ফাতেমা খাতুন হলেন হযরত মাওলানা সৈয়দ মছিহ্ উল্লাহ্ মির্জাপুরী (রহ.)'র শ্রদ্ধেয় আম্মাজান। আর তাঁর দ্বিতীয় কন্যা সৈয়দা খায়রুন্নেসা (রহ.)। তিনি গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র মহীয়সী আম্মাজান। সম্পর্কের দিক থেকে গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) এবং হযরত মাওলানা সৈয়দ মছিহ্উল্লাহ্ মির্জাপুরী (রহ.) হলেন আপন খালাতো ভাই। একই সঙ্গে হযরত মাওলানা সৈয়দ মছিহ্ উল্লাহ্ মির্জাপুরী (রহ.) হলেন অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র নানাজান।

তথ্যসূত্র: ছৈয়দ মছিহ্ উল্লাহ মির্জাপুরী (কঃ)'র জীবনী ও কেরামত

লেখক: ছৈয়দ মছিউল করিম মির্জাপুরী (রহ.)

- আলোকধারা একই সংখ্যার ১৩৩ পৃষ্ঠায় সাক্ষাৎকার পর্বে শাহ্জাদী সৈয়দা নাজমুন নেসা মাইজভাণ্ডারীর পরিচয় 'ছোট জা' উল্লেখ করা হয়েছে। মূলত তিনি হলেন উম্মুল আশেকীন হযরত মুনাওয়ারা বেগম (রহ.)'র ছোট ননদ। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

অধ্যাপক জহুর উল আলম
সম্পাদক
মাসিক আলোকধারা

শান্তির অন্বেষণ : ইসলামী নিরিখ

♦ মুহাম্মদ ওহীদুল আলম ♦

ইসলাম এক বিশ্বজনীন ধর্ম

ইসলাম একটি বিশ্বজনীন ধর্ম। এর রয়েছে এক বিশ্বদৃষ্টি। ইসলামের আকুতি ও আহ্বান মানুষের কল্যাণময়তার দিকে। আল কোরআনের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে মানুষ। ইসলাম মানুষকে তার জীবনের উদ্দেশ্য ও বিধেয়কে চিহ্নিত করে দিয়েছে। মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সে তার একমাত্র স্রষ্টার ইবাদত করবে, আর বিধেয় হচ্ছে সে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমার বাইরে যাবে না। এ ইবাদত মানে নির্দিষ্ট দু একটা আনুষ্ঠানিক আচরণ নয় বরং আল্লাহ্‌র আদেশের প্রতি পুরোপুরি আনুগত্য প্রদর্শন ও তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে সচেতনভাবে বিরত থাকা।

ইসলাম গ্রহণে সহজতা

ইসলাম গ্রহণ অতি সহজ। যে কেউ আল্লাহ্‌তে পরিপূর্ণ বিশ্বাস করে এবং হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ রাসুল হিসেবে মেনে নেয় সেই-ই ইসলামে প্রবেশ করে। ইসলাম গ্রহণ করলে মানুষের অতীত পাপসমূহ মুছে যায়। ইসলাম-পূর্ববর্তী জীবনে যে সম্মানিত ইসলামে দাখিল হবার পরও সে একইভাবে সম্মানিত থাকে।

ধর্মে কোনো জোর জবরদস্তি নেই

কাউকে জোর করে মুসলমান করার কোনো সুযোগ নেই। যে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে না তার ঈমানের দাবি ভিত্তিহীন। মানুষকে জোর জবরদস্তিভাবে কোনো বিশ্বাসে স্থিত করা যায় না। বিশ্বাস একটি মানসিক ব্যাপার। মানুষের মনের ওপর জোর খাটানো যায় না। জোর করলে বড়জোর মুনাফিক (কপট বিশ্বাসী) হয়, মু'মিন নয়। এ ধরনের ধর্মান্তর অনুমোদিত নয়, গ্রহণযোগ্যও নয়।

তলোয়ারের জোরে ইসলাম

তলোয়ারের জোরে ইসলাম প্রচারিত ও প্রসারিত হয়নি। অথচ এ ধরনের একটি আপ্তবাক্য কারো কারো মুখে শোনা যায় ও লেখাজোখায় বর্ণিত হয়। তারা মিথ্যাবাদী। তাদের দাবি ভিত্তিহীন। এই একবিংশ শতাব্দীতে এসেও কোনো কোনো বোদ্ধা মানুষ ইসলাম গ্রহণ করছেন। তাঁদের ইসলাম গ্রহণের পেছনে তলোয়ারের ছায়া মাত্রও নেই। দুর্ধর্ষ মোঙ্গোলরা পরাজিত মুসলমানদের ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করেছিল এর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে। তখন মুসলমানদের হাতে কোনো তলোয়ার ছিল না। বরং তলোয়ার ছিল ইসলাম ও মুসলমানদের ওপর হামলাকারীদের হাতে।

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ইসলাম

ইসলাম সব সময় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে। ইসলামের দৃষ্টিতে ফিত্‌না হত্যার চেয়েও ভয়াবহ। বিনা কারণে কোনো মানুষকে হত্যা করা গোটা মানবজাতিকে হত্যা করার সামিল। একজন মানুষের জীবন রক্ষা করা মানে সমগ্র মানবজাতিকে সুরক্ষা দেয়া। পবিত্র কোরআন আমাদের এ শিক্ষাই দিয়ে থাকে।

ইসলামের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস

বিপরীতে ইসলামের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস যুগে যুগে দৃশ্যমান। কাবিলের হাত দিয়ে তা শুরু। বর্তমান যুগে ফিলিস্তিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইহুদীদের বর্বরতার কথা কে না জানে? সর্বশেষ নবি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুয়ত প্রকাশের পর মক্কী জীবনের প্রথম তের বছর তো মক্কার কর্তৃত্ববাদী শক্তির হাতে লাগাতার নির্যাতনের মধ্য দিয়েই কেটেছে। মাদানী জীবনেও তৎকালীন রাজনৈতিক শক্তি ছোট বড় পঁচাশিটি যুদ্ধ করেছে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে। আর ইসলামের বিরুদ্ধে তথ্য সন্ত্রাস তো বহাল রয়েছে এখনো।

মূল ফোকাস : শান্তি

ইসলামের মূল ফোকাস হচ্ছে শান্তি। এ শান্তির প্রত্যাশা ও আবেদন ব্যক্তি পর্যায় থেকে আরম্ভ করে আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত। ইসলাম ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে, সমাজে-সমাজে, গোত্রে-গোত্রে, রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে, জাতিতে-জাতিতে, ধর্মে-ধর্মে সদ্‌ভাব, সহাবস্থান ও শান্তি স্থাপনে আগ্রহী।

মানবজাতির উৎসমূল

ইসলামের দৃষ্টিতে মানবজাতির উৎসমূল এক। পবিত্র কোরআনে ঘোষিত হয়েছে: হে মানবজাতি! তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তারই থেকে তার জোড়া (সঙ্গীনী) সৃষ্টি করেছেন, আর এ দু'জন থেকে বহু নর-নারী বিস্তার করেছেন −(সূরা নিসা : ১)। তাই মানুষ হিসাবে সকলের মর্যাদা এক। তাদের সবার অধিকারও একই রকমের।

চিরুনীর দাঁতের মতো

মানুষে মানুষে সাদা ও কালোর মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই। ‘কালো ও ধলো বাহিরে কেবল, ভেতরে সবার সমান রাঙা।’ রাসুলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: ‘পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ চিরুনীর দাঁতের মতো সমান।’

গোত্রে ও জাতিতে বিভক্তি

মানবজাতি বিভিন্ন গোত্রে ও জাতিতে বিভক্ত। এর বিভক্তি সৃষ্টির বৈচিত্র নির্দেশক। মানবজাতিকে বিভিন্ন গোত্র ও জাতিতে বিভক্ত করা হয়েছে যাতে তারা পরস্পর পরিচিতি লাভ করতে পারে। একেক জাতি ও গোত্রের আলাদা আলাদা গুণ ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এক জাতির মধ্যে যে গুণ ও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান তা হয়তো অন্য জাতির মধ্যে নেই। পরস্পর পরিচিতি লাভ করার ফলে এক জাতি অন্য জাতির গুণ ও বৈশিষ্ট্য দ্বারা উপকৃত হতে পারে। এতে ঘটতে পারে জাতিগত সমৃদ্ধি। তারা হতে পারে সমভাবে লাভবান। ফলস্বরূপ এক জাতির মানুষ অন্য জাতির মানুষের কাছাকাছি আসতে পারে। এতে বেড়ে যেতে পারে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা।

সহাবস্থান

তাই ইসলাম মানবজাতির সহাবস্থানে বিশ্বাসী। স্ব স্ব জাতি স্বীয় দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে অন্যের অধিকার ক্ষুণ্ন না করে নিজ নিজ অধিকার অবাধে ভোগ করতে পারে। প্রত্যেক মানুষই স্বাধীন– যদি না সে অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে। প্রত্যেক জাতি ও ধর্ম বিশ্বাসী মানুষের ক্ষেত্রে এ কথা সমভাবে প্রযোজ্য।

গোটা সৃষ্টি আল্লাহ্র পরিবার

আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, যা আমরা দেখি কিংবা দেখি না, সবই এক আল্লাহ্র সৃষ্টি। হাদিস শরিফে উল্লেখিত হয়েছে: সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহ্র পরিবার স্বরূপ। সে-ই আল্লাহ্র কাছে সর্বাধিক প্রিয়, যে তাঁর সৃষ্টির সর্বাধিক কল্যাণ সাধন করে। [সূত্র: আবদুল্লাহ আল মামুন আল সোহরাওয়ার্দি কৃত সেয়িংস অব মুহাম্মদ (সা.), হাদিস নং : ৩৫]।

আরো দু'টো হাদিস

এ প্রসঙ্গে আমরা আরো দু'টো হাদিস পাঠ করতে পারি। এক. মানুষের মাঝে সেই সর্বোত্তম যার দ্বারা মানবতার সর্বাধিক উপকার সাধিত হয়। দুই. যে আল্লাহ্র সৃষ্টির প্রতি দয়া করে আল্লাহ্ তাকে দয়া করেন। অতএব পৃথিবীর মানুষের প্রতি দয়া করো, হোক সে মানুষ ভালো বা মন্দ। আর মন্দ লোককে দয়া করা মানে তাকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা। যাতে করে আসমানে যাঁরা আছেন তাঁরা যেন তোমাদের প্রতি দয়া করেন। (সূত্র: প্রাগুক্ত, হাদিস নং ৩৪-৩৭)।

নবি রাসুলগণের আহ্বান

পৃথিবীর মানুষকে সঠিক পথ-নির্দেশ প্রদানের জন্য আল্লাহ্ তা'য়ালা অসংখ্য নবি-রাসুল (তাঁদের সবার ওপর বর্ষিত হোক আল্লাহ্র অপার শান্তি ও রহমত) পাঠিয়েছেন। মানুষের প্রতি তাঁদের সবিশেষ আহ্বান ছিল; পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করোনা।’ বস্তুত পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীরাই আখিরাতে সর্বাধিক বিপর্যস্ত হবে।

শান্তির আহ্বান

আরাফাতের ময়দানে বিদায় হজের ভাষণে রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শেষ আহ্বান ছিল: ইয়া আইয়্যুহান্নাস– আস সাকিনাহ। ‘হে মানবজাতি তোমরা শান্তিতে থাকো।’

আসুন আমরা সবাই মিলে শান্তির অন্বেষণে ব্রতী হই।

আল কোরআনের বাণী

“(হে নবি!) বলুন, হে কিতাবিরা! এসো! আমরা আমাদের কিতাবের অভিন্ন কথায় একমত হই। (কথাটা খুব সহজ) আল্লাহ্ ছাড়া কারো উপাসনা করব না। আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরিক করব না। আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে বা কোনো মানুষকে প্রতিপালক বা প্রভুরূপে গ্রহণ করব না” – (সূরা আলে ইমরান : ৬৪)।

“দেখে যারে মাইজভাণ্ডারে হইতেছে নূরের খেলা নূরী মাওলা বসাইল প্রেমের মেলা”

♦ হাসনাত হাসান রাহাত ♦

কোন শুভক্ষণে সুফি সাধকদের নিয়ে অন্তরের অলিন্দে লেখা-লেখির ভাবনা জাগ্রত হয় তা এখন মনে নেই। তবে এ ধরনের লেখার কারণে আমার সংযোগ স্থাপিত হয় মাইজভাণ্ডারী একাডেমির তাসাওউফ ভিত্তিক মুখপত্র আলোকধারার সঙ্গে। সম্পর্কের মধ্যমণি হলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যে মেধা তালিকায় সর্বশীর্ষ স্থান দখলকারী “ফ্যাকাল্টি ফার্স্ট” মো. আকিব। মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ সমকালীন বিশ্বে আল্লাহ্ প্রেমিকদের নিকট এক মনমোহিনী নাম। ভুবনজুড়ে এর অদম্য পরিচিতি মহাস্রোতের মতোই প্রবহমান। তাই মাসিক আলোকধারা অফিসে গমনমাত্রই হযরত শাহ্ মোহসেন আউলিয়া সম্পর্কে লিখা জমা দিয়ে লেখক তালিকাভুক্ত হলাম। আলোকধারার সঙ্গে সম্পর্কের এক বৎসর পূর্ণ হয়েছে, অথচ আলোকধারার উৎসস্থল মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে কখনো যাওয়া হয়নি। মাইজভাণ্ডার শরিফে গমনের বিষয়ে উৎসুক্যের কমতি ছিল না। তবে সময় সুযোগ বলে একটি কথা আছে। গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র দ্বিশততম পবিত্র জন্মবার্ষিকী এবং ১২০তম উরস উপলক্ষ্যে এ সুযোগ এসে যায়। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ছিলাম, ইনশাআল্লাহ্ এবার মাইজভাণ্ডার শরিফ যাবোই। আত্ম শপথে বলীয়ান হয়ে জীবনে প্রথমবারের মতো মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ গমন। সে এক অনন্য অনুভূতি। মূলত প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে মহান ১০ মাঘ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন হচ্ছে আজকের এ নিবন্ধ।

ছবিতে আগেই দেখেছি, জাতীয় ফুল শাপলার আদলে নির্মিত বিশাল আকৃতির মাজার। এখন প্রত্যক্ষদর্শী হলাম। মাজারে জনমানুষ এবং অসংখ্য ভক্তের উপচে পড়া ভীড়। প্রতিবছর ১০ই মাঘ ত্বরিকায়ে মাইজভাণ্ডারীয়ার প্রবর্তক গাউসুল আযম মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র (১৮২৬-১৯০৬) বার্ষিক উরস দিবস পালন করা হয়। তবে এ বছর একটু ভিন্ন কারণে উরসের মহত্ত্ব আরও উৎসবমুখর মনে হয়েছে। কারণ হযরত গাউসুল আযমের ১২০তম উরস বার্ষিকীর পাশাপাশি এ বছর ছিল তাঁর দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী। ফলে জনস্রোত অকল্পনীয় মাত্রায় আরও বৃদ্ধি পায়।

উরসের পরিবেশ :

২৩শে জানুয়ারি, রোজ শুক্রবার, মুসলিমদের জন্য একটি পবিত্র দিন। দিনের পবিত্র কাজগুলো শেষ করে সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ বাসা থেকে দুইদিনের প্রস্তুতি নিয়ে বের হলাম। অল্প সময়ের মধ্যে অক্সিজেন এসে পৌঁছালাম। অক্সিজেন এসে আরও দুইজন যাত্রী সঙ্গীর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। এর মধ্যেই উপস্থিত হলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের আকিব ভাই ও মাদ্রাসা শিক্ষার্থী আবদুল্লাহ্ ইমরান। আমাদের তিনজনেরই যাওয়ার কথা উপমহাদেশের সুবিখ্যাত দরবার মাইজভাণ্ডার শরিফ। গন্তব্যের গাড়ি পেতে দেরি হলো না। কারণ ভক্তের প্রাণস্থল বলে কথা। যথা নিয়মে যাত্রা শুরু হলো অক্সিজেন থেকে। গাড়িতে উঠলাম তিনজনই। আমার পাশে আকিব ভাই ও অন্য সিটে বসলো আবদুল্লাহ্। সিটে বসতেই গাড়ি ছেড়ে দিলো। সিটে হিমশীতল বাতাস গাড়ির জানালা দিয়ে ঢুকে গায়ে হালকা ছোঁয়া দিতেই মনের এক কোণে শিহর জেগে উঠলো। শহরে শীতের আবেশ কম। ফলে গ্রামের দিকে যাওয়ার একটা আভাস শরীর ইতিমধ্যে আন্দাজ করে নেয়।

আজ এমন এক জায়গার উদ্দেশ্যে যাত্রা যেটি অগণিত ভক্তের শ্রদ্ধা ও পরম ভালোবাসার কেন্দ্রস্থল। ঘন্টা দু-একের মধ্যে গন্তব্যের যাত্রাপথ শেষ হলো। ঢোকার মুহূর্তে চোখে পড়ল বিশাল ঐতিহ্যময়ী গেইট বাবে শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)। প্রাচীনত্বের স্পষ্ট ছাপ নেই ঠিকই, তবে ভক্তকূলের ব্যাপক সমাবেশ নজরে এলো। শুনলাম বাস নাকি আর ভিতরে যাবে না। চোখ মেলে দেখলাম এটা ঝংকার নামক এলাকা। ভাবতে লাগলাম ঝংকার আবার কিভাবে আসলো। হঠাৎ আকিব ভাই ডাক দিলো। বললো বাস আর যাবে না, এখান থেকে আমাদেরকে সিএনজি করে মূল দরবারের ফটকে যেতে হবে। এ সময়ে সিএনজির অভাব দেখা দিলো। হঠাৎ করে খালি সিএনজি দেখা মাত্রই আমরা তিনজন উঠে পড়লাম। পথেই শত শত স্বেচ্ছাসেবকদের দেখা মিললো। মূলত যানযট না হওয়ার জন্য তাদের যতো প্রচেষ্টা। চলমান সিএনজি থেকে দূরে বিভিন্ন মন্‌জিল গুলোর আলোকসজ্জা দেখা যাচ্ছে। রাস্তার দু'ধারে অনেক ভবন। সব ভবনই আলোয় আলোয় সুসজ্জিত।

শীতের আবেশ ক্রমেই অনুভূত হতে লাগল। আশপাশের পরিবেশ বেশ প্রাণবন্ত। কাল গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারীর উরস, ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম হবে বলেই নিয়ম-শৃঙ্খলায় কোনো ঘাটতি রাখে নাই দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিটিগুলো।

প্রায় চার কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করে সিএনজিতে এসে নামলাম দরবারের প্রধান ফটকে। গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র নামে নির্মিত এ ফটক। নামতেই দেখলাম বিশাল বিশাল 'ভাণ্ডারী মুলার' সমাহার। উরস মৌসুমে এ ভাণ্ডারী মুলার বিশেষ কদর রয়েছে। ফলে চাষীরা বিভিন্ন ছোট রাস্তার নিকটবর্তী অংশে বিক্রি করতে তাবু টাঙিয়েছে। পাশে ভক্তকূলের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন ভাসমান দোকানের উপস্থিতি দেখতে পেলাম। প্রথম ফটক থেকেই ভক্তকূলের পরম ভালোবাসার প্রকাশ চোখে পড়ল। ভক্তরা ফটক থেকে পায়ের জুতা খুলে হাতে নিয়ে গভীর ভক্তিভরে রওজার উদ্দেশ্যে হাঁটা শুরু করল। অল্প সময়েই মনে হলো, দূর শহরের নিকটে আরেকটি শহরে আমরা পৌঁছে গেছি। কী নেই সেখানে! স্বেচ্ছাসেবীদের শ্রদ্ধা ও সহযোগিতার কোনো কমতি নেই।

ঢুকতেই রাস্তার বাম পাশে তিনটি মাজার। একটি নবনির্মিত, এখনো কাজ চলছে। আর একটি বড় পরিসরের। নতুন মাজারটি হল হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ শহীদুল সরোয়ার মাইজভাণ্ডারীর। বড়টি তাঁর পিতা সুলতানুল আরেফিন শাহ্ সুফি সৈয়দ সামশুল হুদা মাইজভাণ্ডারীর। এরপর হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ নূরুল হুদা মাইজভাণ্ডারীর মাজার। রাস্তার পূর্বপাশে সৈয়দ নিজামুদ্দিন মাইজভাণ্ডারীর আসন। তিনি অগ্রণী ব্যাংকের এমডি পদে কর্মরত ছিলেন। এরপর মঈনিয়া মন্জিল অতিক্রম করে মাইজভাণ্ডার দরবারের জামে মসজিদের পাশ ঘেঁষে শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (ক.) রওজার নিকট পৌঁছলাম। শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) নাম চোখে পড়ামাত্র অন্তরে একধরনের আলোড়ন সৃষ্টি হল। রওজার গেইটে ঢুকতেই ভক্তদের সমাগম বাড়তে লাগলো। পাশেই জুতা জমা রাখার স্থান দেওয়া হয়েছিল। সেখানে দীর্ঘ সময় ধরে হাতে নেওয়া জুতাগুলো স্বেচ্ছাসেবীদের কাছে জমা রাখলাম। ভেতরে প্রবেশ করতেই ভক্তদের সেবায় নিয়োজিত বিভিন্ন ইউনিটের সঙ্গে পরিচয় হতে হলো। রওজার নিকট আলোকধারা প্রকাশনীর বুক স্টল ছিলো। স্টলে পূর্ব পরিচিতদের অনেকের সাথে দেখা হলো। তখন রাত ১০টা বাজে। সাখাইরুল ভাইয়ের সাথে দেখা হতেই জিজ্ঞেস করলেন– রাতে খাওয়া-দাওয়া হয়েছে কিনা? বললাম এখনো কিছু খাইনি, তখন সাখাইরুল ভাই পকেট থেকে কিছু টোকেন বের করলেন। জানতে চাইলেন আমরা কয়জন? তিনজন বলাতে তিনজনের জন্য তিনটি টোকেন দিলেন। আকিব ভাই টোকেনগুলো নিলেন। দরবারে খাবারের জন্য রয়েছে পুরাতন বাড়ির ভাণ্ডারখানা।

টোকেন নিয়ে খেতে গিয়ে দেখলাম বিশাল খাবার-দাবারের আয়োজন। একপাশে মহিষ-গরু জবাই চলছে, অন্যপাশে রান্না হচ্ছে। রান্নার সাথে সাথে কয়েকতলা বিশিষ্ট ভবন (শান্তি কুন্জ-২)-এর উপরে-নিচে সবখানে শৃঙ্খলা মেনে তবার্‌রুক দেওয়া হচ্ছে। এ শৃঙ্খলা দেখে অবাক হলাম। এতো মানুষের জনস্রোত তারপরও নিয়মের কোনো হেরফের নেই। সবাই ধৈর্যের সাথে লাইনে দাঁড়িয়ে খাবার বা তবার্‌রুক নিচ্ছে। তবার্‌রুক দেওয়া হলো ঐতিহ্যবাহী "সনে" (সন হলো মাটি দিয়ে তৈরি বাসন)। আমরাও যথা নিয়মে টোকেন জমা দিয়ে তবার্‌রুক নিয়ে 'ধারাতে' (বাঁশের চাটাই) বসলাম। এখানেও কিছু স্বেচ্ছাসেবক পানি পান করার দায়িত্ব পালন করে চলছে। এভাবে এখানে হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক কাজ করছে স্বইচ্ছায়। দরবারের একটি গুরুত্বপূর্ণ আলামত উপলব্ধি করলাম, দরবারে গিয়ে কেউ খালি পেটে বা খালি হাতে ফেরে না। দরবার শুধু খাবারের আয়োজনেই সীমাবদ্ধ নয়; এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে নানা সাংস্কৃতিক আয়োজনও। উরসের আগের এই রাতটি তাই ছিল বেশ জমজমাট ও প্রাণচঞ্চল।

সামা মাহফিল :

রাতের খাওয়া-দাওয়ার পর ১২টা নাগাদ উরসের জৌলুস দেখার জন্য ঘুরতে লাগলাম। তখন শাহানশাহ্‌র রওজা মোবারকের পাশে শান্তিকুঞ্জ মাঠে "সামা মাহফিল" অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মাইজভাণ্ডারী সামা হলো চিশ্‌তিয়া ও মৌলবিয়া ত্বরিকার সম্মিলিত সংগীতধারা, যেখানে হাত তুলে সংগীতের সঙ্গে ভক্তিসহকারে নৃত্য করা হয়।

সামায় ভক্তদের ভক্তি দেখে যে কেউই বিস্মিত হবে। ভক্তদের প্রেমময় আবেগ ও গানের সুর মিলেমিশে শান্তিকুঞ্জের মাঠকে একাত্ম পরিবেশের রূপ দিয়েছে। গানের তালে তালে হাত উত্তোলন করে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী এবং শাহানশাহের প্রতি ভক্তদের শ্রদ্ধা ও নিবেদন মানুষকে মনের এক গভীর স্তরে নিয়ে যায়, যেখানে আশপাশের পরিবেশের সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক থাকে না। কখনো কখনো দেখা যায়, ভক্তরা গানের

সুরে এমনভাবে মিশে যায় যে সে অচেতন হয়ে পড়ে। দীর্ঘ সময় ধরে সেই অচেতন অবস্থা কাটিয়ে উঠতে সময় লাগে, যেমন একটি দুগ্ধপোষ্য শিশুকে মায়ের কোল থেকে আলাদা করতে সময়ের প্রয়োজন হয়।

এই সময় বন্ধু মিনহাজ, শিবলু, মাহতাব ও আকিব ভাই গভীর শ্রদ্ধায় সামার সঙ্গে নিজেদেরকে মিলিয়ে নেন। সামা মাহফিল শেষ হতে হতে রাত ২টা বেজে যায়। মাহফিল ত্যাগ করে দেখলাম যথারীতি মানুষের ঘুমানোর প্রস্তুতি শুরু হচ্ছে। তারপরও ভক্তদের ভক্তির কোনো ঘাটতি চোখে পড়েনি। ভক্তরা অবিরাম রওজায় আসছে, যাচ্ছে এবং জিয়ারত করছে।
সামা পরবর্তী আমাদের (আকিব ভাই, মিনহাজ, মাহতাব, শিবলু, আবদুল্লাহ্ ও অন্যান্য) ভোর ৪টা নাগাদ ঘুমানোর জন্য নিকটবর্তী আজিমনগর উম্মুল আশেকীন মুনাওয়ারা বেগম এতিমখানা ও হেফজখানায় ব্যবস্থা হলো। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার মানুষের সমাগম আরও বাড়তে লাগল। অবশেষে আমরা ঘুমানোর গন্তব্যে রওনা দিলাম।

জনস্রোত :

পরেরদিন আজিমনগর এতিমখানায় সকাল ১০টা পর্যন্ত অবস্থান করি। আবারও সবাই বেরিয়ে পড়লাম মহান উরস প্রত্যক্ষ করতে। ২৪শে জানুয়ারি, আজ উরসের প্রধান দিবস। ফলে ফটক থেকেই অগণিত মানুষের জনস্রোত চোখে পড়ার মতো। ভক্তদের আসা-যাওয়া ক্রমাগত বাড়তেই থাকে। ভক্তদের সংখ্যা এত বেশি যে তাদের গাড়ি রাখার জন্য কয়েকটি স্থানে ১/২ কিলোমিটার দূরত্ব জুড়ে পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিভিন্ন মন্‌জিলে আজ জনসমাগম অত্যধিক। মেহমানদের ভিড় ও ভক্তদের উপস্থিতি দেখে যে কেউ অভিভূত হয়ে যাবে। অসংখ্য মানুষ শ্রদ্ধার সাথে হেঁটে হেঁটে আসছে তাঁদের পরম প্রিয় গাউসুল আযমকে স্মরণ করতে। এ যেন এক অলৌকিক দৃশ্য। সকাল থেকে মানুষের ঢল বাড়তে বাড়তে সন্ধ্যায় এসে এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে শত মিটার হাঁটতেই ঘণ্টাখানেক সময় লেগে যায়। এখানে মানুষ যেন নিজে হাঁটে না; জনজটের স্রোতেই স্বাভাবিকভাবে রওজার দিকে এগিয়ে যায়। অনেকে হয়তো জানতে চাইবে সংখ্যা কত? কিন্তু এই শ্রদ্ধা ও ভক্তিকে সংখ্যায় মাপা যায় না। এই উরসে প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম ঘটে।

গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী এবং বাবা ভাণ্ডারীর রওজা শরিফ :

১০ মাঘ উরসের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছেন গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)। জনস্রোতের গতি তাঁর রওজার সম্মুখে স্থিত হচ্ছে। বিশাল রওজা আধুনিক স্থাপত্য এবং ইসলামী ঐতিহ্যের মিশ্রণে নির্মিত অন্যতম দর্শনীয় স্থানও বটে। রওজায় গণ মানুষের আহাজারি-আর্জি-ফরিয়াদ অন্তরে অনন্ত ব্যাকুলতার সৃষ্টি করে। প্রত্যক্ষদর্শী ব্যতীত তা অনুমান করা অসম্ভব। রওজা মাঠের মধ্যে অসংখ্য মানুষ বসে বসে বাদ্য বাজনার তালে তালে হালকা জিকিরে মত্ত। মাঠের বায়ু (উত্তর-পশ্চিম) কোণে অবস্থিত গাউসুল আযম বিল বিরাসত হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র রওজা। এখানেও আশেক-ভক্তের ভক্তি ও শ্রদ্ধার শেষ নেই। এখানেও দেখলাম এক অপরূপ দৃশ্য।

হাদিয়া মিছিল :

মন্‌জিলগুলোর ভক্তকূলের বিভিন্ন কমিটি রয়েছে। এসব ভক্তরা মহিষ, গরু, উট, গয়াল ও ছাগলসহ নানা ধরনের হাদিয়া নিয়ে আসেন। এই হাদিয়াগুলো আবার ভক্তদের জন্যই ভাণ্ডারখানা থেকে শৃঙ্খলা অনুযায়ী ব্যয় করা হয়। বিপুল জনসমাগমের মধ্যে সহজে হাদিয়া পৌঁছানোর জন্য রয়েছে হাদিয়া মিছিলের স্বেচ্ছাসেবী দল। তাদের আন্তরিক যত্ন ও উষ্ণ অভ্যর্থনার মাধ্যমে প্রধান ফটক থেকে হাদিয়াগুলো মিছিল করে ভাণ্ডারখানায় পৌঁছে দেওয়া হয়।

হাদিয়ায় এত পরিমাণ গরু-মহিষ ও অন্যান্য সামগ্রী আসে যে দীর্ঘ সময় ধরে ভক্ত ও মেহমানদের খেদমতে ব্যয় করেও সহজে শেষ হয় না। আমার দেখায়, শুধু মহিষই হাদিয়া হিসেবে এসেছে হাজার দুয়েক। প্রতিটি গরু-মহিষের আকৃতিও বিশাল প্রায় সোয়া ৮-১০ মণ পর্যন্ত। সুতরাং রান্না-বান্না ও আয়োজনের জৌলুস কতটা বিস্তৃত, তা সহজেই অনুমান করা যায়। হাদিয়া নিয়ে মিছিলে ভক্তদের চোখের আনন্দ দেখে যে কেউ আবেগে আপ্লুত হবেই।

আলোকধারা বুক স্টল :

উরসের দিনে শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্টের অধীনস্থ আলোকধারা বুক্স প্রকাশনীর বইয়ের স্টলে আজ ছিল বিশেষ আকর্ষণ। মোট ৫টি স্টলের মাধ্যমে আলোকধারা থেকে প্রকাশিত প্রায় ৮০ ধরনের বই প্রদর্শন ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়। আলোকধারা মাসিক

ম্যাগাজিনের লেখক হিসেবে আকিব ভাই, আমি, মিনহাজ, শিবলু, আবদুল্লাহ্, মাহতাব, সাখাইরুল ভাইসহ আরও অনেকে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি।

সকাল ১১টা নাগাদ আমাদের স্টল বসানো হয় হোসাইনি দাতব্য হাসপাতালের নিকটে। স্টলে ছিলাম আকিব ভাই, আমি ও আবদুল্লাহ্। ধীরে ধীরে নানা বয়সী মানুষের আনাগোনা শুরু হয়। সকাল থেকে রাত ৪টা পর্যন্ত টানা আমরা নানান ধরনের বই বিক্রি করলাম। পাঠকরা অত্যন্ত যত্ন ও আগ্রহের সঙ্গে বই কিনছিলেন। তাদের বই পড়ার আগ্রহ দেখে আমাদের উদ্যম আরও বেড়ে যায়।

বই সম্পর্কে আমাদের ভালো ধারণা ছিল, বিশেষ করে আকিব ভাইয়ের। তাঁর ইতিমধ্যে রচিত কয়েকটি অনুবাদ বই প্রকাশিত হয়েছে। ফলে তিনি ক্রেতাদের সহজেই বই কেনার প্রতি আগ্রহী করতে পারতেন। তাঁর বিশেষ বাচনভঙ্গির সহায়তা ও আবদুল্লাহ্‌র প্রচেষ্টায় আমরা ভালো পরিমাণ বই বিক্রি করতে সক্ষম হই।

আলোকধারা বুক্‌স প্রকাশনীর অন্যান্য স্টলগুলোতেও স্বেচ্ছাসেবকদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ছিল লক্ষণীয়। বন্ধু মিনহাজ, শিবলু ও মাহতাবদের স্টল ছিল আহমদিয়া মনজিলের নিকটে। শাহানশাহ্‌র রওজার কাছে ছিল দুটি স্টল, একটি মহিলাদের অন্যটি পুরুষদের জন্য। মূলত রওজার নিকটবর্তী স্টলটিই ছিল প্রধান স্টল। আরেকটি স্টল ছিল দূরবর্তী আজিমনগর ক্যাম্পের পাশে।

সবাই সর্বোচ্চ চেষ্টা নিয়ে সারাদিন ধরে পাঠকদের কাছে বই পৌঁছে দিতে কাজ করেছে। ফলে দিনের শেষে সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। ইতোমধ্যে ভক্তদের দরবার শরিফ ত্যাগ শুরু হয়, জনসমাগম কিছুটা কমতে থাকে। তবে পুরোপুরি কমে না, রাত গভীর হলেও জনমানুষের আগমন অব্যাহত থাকে।

শেষ রাতে আমরা প্রায় ১০ জন আগের রাতের মতো উম্মুল আশেকীন মুনাওয়ারা বেগম এতিমখানা ও হেফজখানায় ঘুমানোর উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। পথে এখনও ভক্তদের দরবার শরিফের কাছে জিয়ারত করতে দেখা যাচ্ছিল। প্রায় পাঁচ-দশ মিনিট হাঁটার পর গন্তব্যে পৌঁছালাম। পরদিন আমাদের বাড়ি ফেরার তাড়াহুড়া ছিল, তাই সবাই দ্রুত ঘুমিয়ে পড়লাম।

রওজার প্রতি ভক্তি :

পরের দিন ২৫শে জানুয়ারি সকাল ১০টায় সবার ঘুম ভাঙল। সবার দরবারের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও পরম ভালোবাসার কারণে এই মুহূর্তে মাইজভাণ্ডার ত্যাগ করে আসতে কষ্ট লাগছিল। কিন্তু সবাই নিজ নিজ কাজে আবদ্ধ ছিল। ফলে শেষবারের মতো রওজা শরিফের জিয়ারত করার উদ্দেশ্যে এতিমখানা থেকে রওনা হলাম। এবার সবাই তল্পিতল্পা গুছিয়ে নিলাম। রওজায় পৌঁছে প্রথমেই সবার প্রিয় ঐতিহ্যবাহী তবার্‌রুকের স্বাদ নিলাম শেষবারের মতো। তবার্‌রুক গ্রহণের পর আমরা আবার আমাদের মূল বুক স্টলে ফিরে এলাম। সেখানে এসে দেখলাম, গাউসিয়া হক মন্‌জিলের সম্মানিত সাজ্জাদানশীন হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী প্রকাশ মওলা হুজুর সাক্ষাৎ দিচ্ছেন। প্রথমে আমরা বিষয়টি লক্ষ্য করিনি। এটি মূলত চট্টগ্রামের বাইরে থেকে আগত ভক্তদের জন্য সাক্ষাৎকার ছিল। ফলে আমাদের মওলা হুজুরের সঙ্গে আর সাক্ষাৎ হলো না। সবাই কিছুটা মন খারাপ করে রইলাম। অবশেষে আকিব ভাইয়ের প্রচেষ্টায় হুজুরা শরিফে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির মাধ্যমে মওলা হুজুরের নিকট জানানো হলো যে আলোকধারার লেখকেরা এই মহান উরসে উপস্থিত ছিলেন।

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে সবাই আবার রওজা শরিফ জিয়ারত করলাম। তখনই যেন সবার মন-প্রাণ প্রফুল্ল হয়ে উঠল। এবার আমাদের বাড়ি ফেরার পালা। সিএনজি করে সবাই মূল গেটে পৌঁছালাম। বাস পেতে কিছুটা কষ্ট হলো, তবু শেষ পর্যন্ত একটি বাস পাওয়া গেল। বাসে আমি, আকিব ভাই, আবদুল্লাহ্, মাহতাবসহ আরও কয়েকজন উঠে পড়লাম। দীর্ঘ যাত্রার পর অবশেষে গন্তব্যস্থল শহরে পৌঁছালাম। তখনো কর্ণ কুহরে ভাসছে মাইজভাণ্ডারী আবহমান সঙ্গীতের সুরের করুণ আর্তি "মাইজভাণ্ডারে উঠেছে তৌহিদের নিশানা, ঘুমাইওনা মায়া ঘুমে আখেরি জামানা।" এভাবেই শেষ হলো আমাদের পবিত্র ১০ মাঘের গাউসুল আযম সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারীর (ক.) ১২০তম উরসের নূরের মেলা এবং প্রত্যক্ষদর্শীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ আমিরুজ্জমান শাহ্ (ক.)

♦ মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন শিবলু ♦

হাবিবে রহমান মেরে বাবাজান
সাহেবে সুলতান আমিরুজ্জমান

মহান রাব্বুল আলামীন প্রিয় নবির উম্মতের মধ্য হতে যুগে যুগে অসংখ্য ইমাম মুজতাহিদীন, আলেম-ওলামা, অলি, গাউস, কুত্ব বা মুজাদ্দিদ প্রেরণ করেছেন, যাঁরা নিজেদের চিন্তা-চেতনা ও সাধনার বলে বিভ্রান্ত ও পথহারা মানুষকে প্রিয়নবির প্রচারিত সত্য ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। ইসলামের দাওয়াত নিয়ে অসংখ্য অলি-দরবেশ আরব তথা মধ্যপ্রাচ্য থেকে পাক-ভারত উপমহাদেশে এসেছেন। আমরা এদেশে ইসলাম পেয়েছি প্রিয় নবির ওয়ারেস বা উত্তরসূরী অলি-দরবেশ, গাউস-কুত্ব ও পীর-মাশায়েখের মাধ্যমে। তাঁদের আগমন না হলে আমরা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে তাওহিদ ও রেসালতের পরিচয় পেতাম না। তাই আল্লাহ্ ও তাঁর প্রিয় হাবীবের পরিচয় জানার পূর্বশর্ত এবং মাধ্যম হচ্ছে আউলিয়ায়ে কেরাম, পীর-মাশায়েখ ও বুজুর্গানে দ্বীন। পূর্ব এশিয়ার বেলায়তের আকাশ যে আলোকরশ্মি দ্বারা উদ্ভাসিত সেই মহান আধ্যাত্মিক সূর্য গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)। এ মহান আধ্যাত্মিক সাধকের ফুয়ুজাতধন্য ও খেলাফতপ্রাপ্ত খলিফা হযরত আমিরুল আউলিয়া মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আমিরুজ্জমান শাহ্ (ক.)। ভূ-গোলকের পূর্ব গোলার্ধের এশিয়া মহাদেশের প্রাচ্য অঞ্চলের ভারত মহাসাগরের উপসাগর বঙ্গোপসাগরের পূর্ব উত্তরে অবস্থিত বাংলাদেশ। এ বাংলাদেশের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত চাটগাঁও তথা চট্টগ্রাম। হযরত গাউসুল আযম কুত্বুল আলম মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি হযরত আমিরুল আউলিয়া শাহ্ সুফি সৈয়দ আমিরুজ্জমান শাহ্ কেবলার জন্মভূমি নানা বৈচিত্রে ভরপুর। কর্ণফুলীর দক্ষিণে ও শংখ নদীর উত্তরে প্রায় মধ্যখানে অবস্থিত এ অঞ্চল বৃটিশ আমল বা তার পূর্ববর্তী সময় থেকে সুপরিচিত। শিক্ষা-দীক্ষা, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কারণে সমুজ্জ্বল এ পটিয়া। হযরত সৈয়দ মুহাম্মদ হামিদ উদ্দীন গৌড়ী (রহ.)-এর একপুত্র পটিয়া হামিদগাঁও বা হাইদগাঁও গ্রাম হতে বর্তমান আমির ভাণ্ডার পুরান বাড়িতে বসবাস করেন। তাঁর নাম হযরত সৈয়দ মা'দন শাহ্। তাঁর বংশে সৈয়দ আমির উদ্দীন শাহ্ এক পুত্র সন্তান। তাঁর পুত্র হযরত সৈয়দ মুহাম্মদ আরেফ মিয়াজী (রহ.)। তাঁর পুত্র হযরত সৈয়দ মওলা চাঁদ (রহ.)। তাঁর ঘরে ১৮৪৫ সালে ১২৫২ বাংলা সনের পয়লা চৈত্র রোজ বৃহস্পতিবার ভোরের সূর্যোদয়ের সময় হযরত সৈয়দ আমিরুজ্জমান শাহ্ শুভ জন্মগ্রহণ করেন। আমিরুল আউলিয়া হযরত সৈয়দ আমিরুজ্জমান শাহ্ (ক.) এশিয়া মহাদেশের বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার এক সুজলা সুফলা মনলোভা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য লীলাভূমিতে মায়ের কোল উজালা করে আগমন করেন। তাঁর মাতার নাম মৌছা. শামসুন্নাহার। আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাগণ দুনিয়াতে শুভাগমন করার সময়েই জাহেরী বাতেনী জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন। যেহেতু তাঁরা একটি অবয়ব ধারণ করে থাকেন সেহেতু অন্য দশ জনের মতো পার্থিব জগতের শিক্ষা বাহ্যিকভাবে গ্রহণ করতে হয়। হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'জ্ঞান আহরণ করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর ওপর ফরজ'। কাজেই নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাক কালামের মর্যাদার্থে ও বাস্তবতায় হযরত আমিরুল আউলিয়াকেও মক্তবে ভর্তি করানো হয়েছিল। অশেষ স্মৃতিশক্তি বলে শিশুকালীন সময়ে তিনি ছিপারা অর্থাৎ আমপারা পাঠ শেষ করে কোরআনুল করিম পাঠ আরম্ভ করেন। দ্রুত কোরআন অধ্যয়নও তিনি শেষ করে ফেলেন। অতঃপর ঝুঁকে পড়েন ফার্সি অধ্যয়নে। ধীরে ধীরে তিনি ফার্সি ভাষায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। ফার্সি ভাষায় রচিত তাঁর অনেক কবিতার সন্ধানও পাওয়া গিয়েছে। তিনি কয়েকটি ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করেন। পুঁথি সাহিত্যে আলাওল রচিত 'পদ্মাবতী' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি আধ্যাত্মিক আলোচনা করতেন। শৈশব না কাটতেই হযরত আমিরুল আউলিয়া হয়েছেন পার্থিবভাবে একজন শিক্ষক। লেখাপড়া শেষ করতে না করতেই তিনি গ্রহণ করেন শিক্ষকতার মহান পেশা ও দায়িত্ব। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে পাকে ইরশাদ করেন : 'তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম, যে কোরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়'। এ আদর্শ অনুসরণে তিনি প্রথমে শিক্ষা অর্জন করে পরে শিক্ষা দানের পন্থা গ্রহণ করলেন। শিশুদের তিনি আমপারা ও কোরআনুল করিম শিক্ষা দিতে শুরু করলেন। অতঃপর সেই সঙ্গে গ্রহণ করলেন মসজিদে ইমামতির দায়িত্ব।

জীবনের বেশির ভাগ সময় কাটিয়েছেন তিনি জাহেরী শিক্ষাদান কাজে। আধ্যাত্মিক শিক্ষক হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার আগে আল্লাহ্পাক তাঁকে জাহেরী শিক্ষক

বানিয়েছেন। সর্বজন স্বীকৃত ব্যক্তিত্ব হিসেবে গ্রামীণ বিচার কাজেও তাঁর ডাক পড়তে লাগলো এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয়জনকে দুনিয়াবী ও ওখরবী (পরকালীন) ক্ষমতা দেয়ার পূর্বে সম্মানিত স্থানে ও পদে নিয়োগ দিয়ে থাকেন। সেজন্য হযরত আমিরুল আউলিয়াকেও সম্মানের পাত্রে পরিণত করলেন। এতদসঙ্গে শুরু হলো পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'য়ালাকে সন্তুষ্ট করার জন্য আরও কঠোর রেয়াজত-সাধনা এবং ইবাদত বন্দেগী। হযরত আমিরুল আউলিয়া বুঝতে পারলেন উসিলা ছাড়া মন্‌জিলে মকসুদে পৌঁছানো সম্ভব নয়। তাই তিনি মুর্শিদের সন্ধান করতে লাগলেন। অতি একাগ্রতার সাথে মুর্শিদ সন্ধান করতে করতে অবশেষে সন্ধান পেলেন পটিয়া থানার অন্তর্গত বড়লিয়া গ্রামের হযরত মাওলানা আবদুর রশিদ (ক.) সাহেবের। তাঁর নিকট গমন করে স্বীয় ইচ্ছা প্রকাশ করলে মাওলানা সাহেব তাঁকে গ্রহণ করেন নিজ ভক্তরূপে। এইভাবে বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হবার পর হুজুর কেবলা তাঁকে নিজ সম্মুখে তলব করে বললেন, 'তোমার খেদমতে আমি খুবই খুশি হয়েছি। কিন্তু তোমার চাহিদা পুরোপুরি মিটাবার ক্ষমতা আমার নেই। আমার আয়ত্বে যা আছে তার মালিক তোমাকে বানিয়ে দিয়েছি। আরও যদি চাওয়া পাওয়া পূরণ করতে চাও, তবে তোমাকে অন্য কোথাও সন্ধান করতে হবে।' এই বলে হযরত মাওলানা আবদুর রশিদ তাঁর ছাত্র ও শিষ্য হযরত আমিরুল আউলিয়াকে নিজ দরবার হতে বিদায় দিলেন। এইভাবে তিনি হযরত মাওলানা আবদুল আজিজ শাহ্ (রহ.), হযরত আজগর শাহ্ (রহ.)সহ পরপর তিনজন মুর্শিদের নিকট হতে কামালিয়ত হাসিল করলেন বটে কিন্তু পরম তৃপ্তি লাভে রইলেন বঞ্চিত। ব্যথিত অন্তরে তিনি মুর্শিদ সান্নিধ্য ত্যাগ করলেন। প্রেম জ্বালা ভীষণ জ্বালা। তাই হযরত আমিরুল আউলিয়া কেবলাও প্রেমাগুণে দগ্ধ হতে লাগলেন। এ চিন্তায় হযরত আমিরুল আউলিয়া বিভোর; এ সময়ে তিনি পটিয়া থানার নিজ গ্রামে হাদু চৌধুরী মসজিদে ইমামতি করতেন। মসজিদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। এ মসজিদে ফজর, জোহর ও আসরের নামাজ পড়া যেত। কিন্তু মাগরিব আর এশা নামায পড়া যেত না। একদিন হযরত আমিরুল আউলিয়া ওই মসজিদের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ রাস্তা দিয়ে মজজুবি হালতে পূর্বদিক হতে আসছিলেন। ওই সময়ে মসজিদে এশার আজান ধ্বনিত হচ্ছিল। আজান শুনে তিনি সম্বিত ফিরে পেলেন, কিন্তু ভুলে গেলেন যে ওই সময়ে মসজিদে যাওয়া যায় না। তিনি দৌড়ে মসজিদ পানে ছুটলেন। ঘাটে গিয়ে দেখতে পেলেন অনেক মুসল্লি অজুরত। তিনিও অজু সেরে মসজিদে প্রবেশ করলেন। নামায শেষে মুসল্লিরা বিনা বাক্যে স্ব স্ব গন্তব্যস্থানে প্রস্থান করলেন, কেবল বসে রইলেন ইমাম সাহেব কেবলা এবং হযরত আমিরুল আউলিয়া। দীর্ঘক্ষণ এভাবে বসে থাকার পর ইমাম সাহেব হযরত আমির আউলিয়াকে সামনে আহ্বান করলেন। ইমাম সাহেব বললেন, 'বাবা, তুমি কি চাও? এভাবে তিনি তিনবার উচ্চারণ করলেন; প্রতিউত্তরে আমিরুল আউলিয়া বললেন, 'আমি মানুষ হতে চাই।' জবাবে ইমাম সাহেব বললেন, 'তুমি যাঁর সন্ধানে আছো তাঁকে এখানে পাবে না। তুমি ঈছাপুর দমদমার কুলে চলে যাও। সেখানে তোমার প্রত্যাশিত মুর্শিদকে তুমি পাবে'। এ নির্দেশ দেওয়ার পরপরই ইমাম সাহেব অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এমন একটি নির্জন স্থানে তিনি কিভাবে গেলেন তাও এক পরম বিস্ময়। এবারে তাঁর মন আরও উতলা হয়ে গেলো। প্রেম ক্ষুধার তাড়না বড়ই যাতনাময়। এই পিরীতির জ্বালা হযরত আমিরুল আউলিয়াকে করে তুলেছিল অস্থির। মনের কৌতূহল নিবারণে তিনি হযরত আকবর শাহ্ (রহ.)-এর শরণাপন্ন হলেন। তিনি এ অস্থিরতার কারণ জানতে চাইলেন। হযরত আমিরুল আউলিয়াও সবকথা তাঁকে খুলে বললেন। তখন তিনি তাঁকে বললেন– 'বুঝতে পেরেছ'? মাশুক তোমাকে আকর্ষণ করছেন। তাঁর সোহবতে না যাওয়া পর্যন্ত তোমার অস্থিরতা কাটবে না। তুমি অনতিবিলম্বে ঈছাপুর দমদমার কুলে চলে যাও। সেখানে গেলেই তুমি ফিরে পাবে দেহ ও মনের শান্তি। এরপর বললেন, 'তোমার প্রার্থীকে বলবে, আমার আমাশয় হয়েছে।' এসব বুঝাপড়া শেষ করে তিনি হযরত আকবর শাহ্ (রহ.) হতে বিদায় নিলেন। কালবিলম্ব না করে পরে ঈছাপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। ঈছাপুরে পৌঁছে তিনি অবাক। যাঁর দেখা তিনি সেখানে পেলেন, তিনিই হাদু চৌধুরী জামে মসজিদে দেখা পাওয়া ইমাম সাহেব ছাড়া আর কেউ নন। আর তাঁরই নাম মোবারক গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)। ওই সময়ে তিনি জজ্‌বাতী হালে ছিলেন। হযরত আমিরুল আউলিয়াকে দেখার সাথে সাথে কালাম করলেন, 'আ-ও ব্যাটা! মেরে পাছ সবকুছ মিল যায়েগী।' তিনি গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর সামনে অতি বিনীতভাবে অগ্রসর হয়ে সিজদায়ে তাহিয়্যা ভক্তিপ্রণতি জানিয়ে নিতান্ত আদব সহকারে সামনে মুখোমুখি হয়ে বসে পড়লেন। হযরত কেবলা আলম (ক.) তাঁকে কবুল করলেন। অতঃপর হযরত আমিরুল আউলিয়া কেবলা স্বীয় মুর্শিদের খেদমতে রত রইলেন। ফার্সি ভাষার বিখ্যাত কবি হযরত শেখ সাদী (র.) -এর শে'রে আছে– 'খেদমতে উস্তাদে বায়দ তাসবি মর্দে কামাল।' অর্থাৎ

উস্তাদের সেবা করলে পূর্ণাঙ্গ সাধু ব্যক্তিতে পরিণত হওয়া যায়। গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী হযরত কেবলা কাবার সোহবতে ও খেদমতে বার বছর পার হতে চলল, এমন সময় একদিন হযরত কেবলা কা'বা তাঁর প্রধান প্রধান খোলাফায়ে কেরাম সহ হুজুরা শরিফে উপবিষ্ট আছেন। হঠাৎ তিনি আমিরুল আউলিয়াকে কাছে ডাকলেন। তিনি হযরতের সম্মুখীন হলে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) নিজ জবান মোবারকে উচ্চারণ করলেন, 'আমিরুজ্জমান মিয়াকো খেলাফত দে দিয়া, আমিরুজ্জমান মিয়াকো খেলাফত দে দিয়া'। অর্থাৎ হযরত আমিরুজ্জমান কে খেলাফত বা প্রতিনিধিত্ব কিংবা বেলায়তী ক্ষমতা ও এযাজত দিয়ে দিলাম। পাক জবান মোবারকে উচ্চারণের সময় অনেক ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এই কালাম শুনবার পর সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হলেন। সেজন্য তিনি মুর্শিদ কেবলার কালাম পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে হুজুরা শরিফ হতে বের হয়ে আসলেন। তখন সময়টি ছিল রৌদ্রোজ্জ্বল। কিন্তু এ কি! তিনি বাইরে আসার সাথে সাথে একখণ্ড মেঘ তাঁর মাথার উপর এসে তাঁকে ছায়া দিতে লাগলো। তিনি বুঝতে পারলেন, মুর্শিদ কেবলা তাঁকে নিখুঁত হীরক খণ্ড দান করেছেন। যে অমূল্য রত্নের প্রতিদান একমাত্র 'আজিজী' বা বিনয়ী হওয়া ছাড়া অন্যভাবে দেওয়া সম্ভব নয়। তাই তো দেখা যায়, আউলিয়ায়ে কেরাম সদাসর্বদা মুর্শিদ প্রেমে বিভোর থাকেন যেন মুহূর্তের জন্যও বিচ্ছেদ না হয়। অতঃপর হযরত কেবলা কা'বা পুনরায় বললেন, 'যাও বেটা, আজ হতে তোমাকে দুনিয়া ও আখেরাতে উভয় জাহানের বাদশাহী দিলাম। তোমাকে বিদায়, তুমি চলে যাও।' তিনিও তৎক্ষণাৎ হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী কেবলা কা'বাকে সিজদায়ে তাহিয়্যা জানিয়ে পেছন দিকে হেঁটে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ ত্যাগ করলেন এবং একইভাবে পটিয়ায় নিজ বাড়িতে এসে পৌঁছলেন। তাইতো আল্লামা শেখ সাদী বলেন– 'দাদে হকরা কাবেলিয়াত শর্ত নিস্ত-বলকে শর্ত কাবেলিয়ত দাদে উস্ত' অর্থাৎ নিজেকে উৎসর্গ করে যিনি মাশুক প্রেমে মত্ত হন, তাঁর কাছে অসম্ভব বলে কিছুই থাকে না। কামালিয়তের পর হযরত আমিরুল আউলিয়া হযরত আকবর শাহ্ (রহ.)-এর মাজার শরিফ চিহ্নিতকরণ করেন। হযরত সৈয়দ আকবর শাহ্ (রহ.) চিরকুমার ছিলেন। তাঁর ইন্তিকালের পর পাড়া-প্রতিবেশী লোকেরা তাদের কবরস্থানে সাধারণ মানুষের মতো তাকে দাফন করে। কারো মনে তিনি যে এত বড় অলি এবং তাঁর মাজারের চিন্তা ছিল না। বহু বছর পর হযরত আমিরুল আউলিয়া (ক.) কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি প্রকৃত কবর শরিফের নিকট গিয়ে হযরত আকবর শাহ্ (রহ.)-এর মাজার নক্শা চিহ্নিত করে চতুর্দিকে খুঁটি স্থাপন করলেন এবং ছাউনি দিয়ে পবিত্র মাজার তৈরি করে দিলেন। সাথে সাথে ফাতেহার আয়োজন করলেন। সকলের জন্য মঙ্গল ও কল্যাণ কামনায় দোয়া করে এ মহতী কাজ শেষ করলেন। এভাবে আল্লাহ্র একজন মহান অলি আরেকজন অলিকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করলেন। হযরত আমিরুল আউলিয়া মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আমিরুজ্জমান শাহ্ (ক.) একদিন মজলিশে উপস্থিত মুরিদ ভক্ত-অনুরক্তবৃন্দের সামনে এ কথা বললেন যে, আমি দুনিয়াতে এমন একটি কাজ করে যাচ্ছি যা কেউ করেনি। আমি জীবদ্দশায় আমার মাজার তৈরি করেছি। আমাকে রাখার জন্য তাবুত (গাছের পাত্র) তৈরি করেছি। সেই তাবুতের পেছনের দিকে দরজার ন্যায় খোলা রেখেছি, যাতে করে ওই দরজা দিয়ে কফিন সহজে ঢুকানো যেতে পারে। আমার দেহ থেকে যেদিন প্রাণ বের হয়ে যাবে, ওইদিন তাবুতে আমার দেহখানি রাখা হবে। এ কথা বলে তিনি জালালী অবস্থায় উপনীত হয়ে ঘুরে ঘুরে তাঁর জবান পাকে বলেছেন– 'ইয়া আমিরুজ্জমান'! প্রতিটি প্রতি উত্তরে তিনি বলেছিলেন 'লাব্বাইকা'। এরপর তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেন। এ মহান অলি ৩ মে ১৯২৭ ইং মোতাবেক ১২ জিলক্বদ, ২০ বৈশাখ রোজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০ ঘটিকায় স্বীয় হুজুরা শরিফে ইন্তিকাল করে মহান রাব্বুল আলামীনের সান্নিধ্যে গমন করেন। সবশেষে স্বীয় মুর্শিদে করিম কর্তৃক পাওয়া ত্বরিকার সিলসিলার খেদমতের জন্যে ত্বরিকার নিজ গদিতে উত্তরাধিকার রেখে গেছেন নিজের ছয় পুত্র তারা হলেন– হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ সোলায়মান শাহ্, হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ খলিলুর রহমান শাহ্ , হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ হাবিবুর রহমান শাহ্, হযরত শাহ্ সুফি ডা. সৈয়দ মোজেহেরুল হক শাহ্, হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ লোকমান হাকিম শাহ্ ও হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ হারুন রশিদ শাহ্। পাশাপাশি অসংখ্য খলিফা রেখে যাবার মাধ্যমে ত্বরিকার প্রচার প্রসারে ভূমিকা রাখার পথ প্রশস্ত করে দেন, খলিফাদের মধ্যে হযরত মাওলানা আবদুর রশিদ শাহ্ (রহ.), হযরত আবদুল জলিল শাহ্ (রহ.), হযরত কালা মিয়া ফকির শাহ্ (রহ.), হযরত চাঁদ বকসু ফকির শাহ্ (রহ.) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। নিজ মুর্শিদ হযরত কিবলা কা'বার ওফাতের পর হযরতের নিজ গদি শরিফে রেখে যাওয়া একমাত্র উত্তরাধিকারী অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী যিনি সারা জীবন যুগসংস্কারের জন্যে অনবদ্য অনবরত সংগ্রাম করেছেন, মুর্শিদের অছি'র সে সংগ্রামের সহযোগী হিসেবে মুর্শিদের

দেয়া গুরু দায়িত্ব আমিরুল আউলিয়া অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পালন করেন। অছিয়ে গাউসুল আযমের ‘আহমদিয়া মন্জিলের’ উন্নয়নমূলক ও ত্বরিকার প্রচার প্রসার এবং যুগসংস্কারের কাজের জন্যে যথাযথ সাধ্যমত খেদমতের আন্জাম দিয়েছেন। সে সময় নতুন যে যুগের সূচনা হয় তার লিখিত রূপ “বেলায়তে মোত্লাকা”র মহান মর্যাদা ও বাস্তবতাকে আমিরুল আউলিয়া নিজে, তাঁর পরিবার এবং স্বীয় দরবারের সবাই মেনে নেন। বেলায়তে মোত্লাকার প্রচার প্রসারে আমিরুল আউলিয়ার যে নির্ভীক সমর্থন ছিলো তা আজও আমির ভাণ্ডারের আওলাদে পাকগণের মাঝে আমরা দেখতে পাই। পটিয়ার জমিনে তৎকালীন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের জন্যে তিনি অসামান্য অবদান রেখেছেন। তখন সুন্নিজামাত এর জন্যে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যে তিনি অগ্রগণ্য সৈনিক ছিলেন। জনশ্রুতি আছে যে, পটিয়া শাহ্চান্দ আউলিয়া কামিল মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা নুরুল হক শাহ্ যে বছর হজে বায়তুল্লাহ্ যান সে বছর কাফেলার সবাই দেশে ফিরে আসলেও হযরত মাওলানা নুরুল হক শাহ্ ফিরেননি। পরবর্তিতে মাওলানা সাহেবের পরিবার আমিরুল আউলিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করলে আমিরুল আউলিয়া অভয় দিয়ে বলেছিলেন মাওলানা সাহেব দ্রুতই ফিরে আসবেন। তখন ঠিকই মাওলানা নুরুল হক শাহ্ সাহেব ফিরে আসলে মক্কা মোয়াজ্জেমায় আমিরুল আউলিয়ার সাথে তার সাক্ষাৎ হয়েছে বিধায় তিনি তাঁর পরিবারের সদস্যদের, ভক্ত ও ছাত্রদের জিজ্ঞেস করেন যে, হযরত আমিরুল আউলিয়াও কি এবার হজব্রত করেছিলেন? তখন মাওলানা সাহেব জানতে পারেন তার দেশে না ফেরা বা দেরি হওয়াতে সবাই আমিরুল আউলিয়ার কাছে মাওলানা সাহেব সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন এবং তিনি ফিরেও এসেছেন। এতে বুঝা যায় আমিরুল আউলিয়ার সারা বিশ্বেই বিচরণ, শুভাকাঙ্ক্ষীদের সহযোগিতা ও বেলায়তের কাজে সদাই নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। বলা বাহুল্য, আমির ভাণ্ডারে সবচেয়ে বড় উরস অনুষ্ঠিত হয় পহেলা মাঘ। এটি মূলত গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)’র পবিত্র বেলাদত শরিফ (জন্মবার্ষিকী) হিসেবে মহাসমারোহে উদ্যাপিত হয়। মূলত তিনি জীবদ্দশায় হযরতের খোশরোজ শরিফের আয়োজন করে ধারাবাহিকতা রেখে গেছেন।

আমিরুল আউলিয়া (ক.) সম্পর্কে ইমাম শেরে বাংলা (রহ.) লিখেছেন,

“মারহাবা ছদ মারহাবা ছদ্ মারহাবা ছদ্ মারহাবা
বাহরে আমিরুজ্জমান শাহে পটিয়া মারহাবা।
দর মিয়ানে আউলিয়া উ বুদে কামিল বেগুমাঁ
ফয়জে ইয়াব আজ গাউসুল আযম আহমদ উল্লাহ্ বেগুমাঁ
সাহেবে কশ্ফো-কারামত বুদে মশহুরে জমাঁ
নে’মতে উজমা বরায়ে আহলে পটিয়া বেগুমাঁ ॥
দর গোবিন্দরখীল পটিয়া রওজায়ে পুরনুরে উ
মরদুমাঁ পুর ফয়জে বাশন্দ দায়েমান আজ জাতে উ॥
তর-ব-তা বাগে জান্নাত চাজে আয় রব্বে জাহাঁ
ইস্তাজিব ইয়া রব তোফাইলে ছরওয়ারে পয়গাম্বরী ॥
নামে নাজিম্ গরতু খাহী শেরে বাঙ্গালা বেদাঁ
মুনকিরানে আউলিয়ারা ছাইফে বুররা বে-গুমাঁ ।”

ভাবার্থ:

পটিয়ার আধ্যাত্মিক বাদশাহ্ আমিরুজ্জমান শাহ্ (ক.)-কে অসংখ্য অগণিত মুবারকবাদ।

তিনি আউলিয়াদের মধ্যে অবশ্যই কামিল ছিলেন।

মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের মহান গাউসুল আযম শাহ্ আহমদ উল্লাহ্ (ক.)-এর পূর্ণ ফয়েজপ্রাপ্ত অন্যতম ইমাম ছিলেন।

তিনি অলৌকিক-কশ্ফ ক্ষমতার অধিকারী যুগের বিশিষ্ট সুপরিচিত আউলিয়া ছিলেন।

তিনি পটিয়াবাসীর জন্য আল্লাহ্ প্রদত্ত বড় নেয়ামত।

পটিয়া শহরের গোবিন্দরখীল (আমির নগর) গ্রামে তাঁর নুরানী রওজা শরিফ অবস্থিত।

সর্বদা তাঁর পবিত্র সত্তার উছিলায় অসংখ্য মানুষ ফয়েজপ্রাপ্ত হচ্ছেন।

হে আল্লাহ্! তাঁর পবিত্র সমাধিকে বেহেশ্তের বাগানে পরিণত করুন।

এই দোয়া সর্দারে আম্বিয়া আক্বা ও মাওলা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এর উসিলায় কবুল করুন।

এই শ্লোকের রচিয়তা হন (ইমাম) শেরে বাংলা (রহ.)।

যিনি আউলিয়া বিদ্বেষীদের জন্য সন্দেহ ছাড়া ধারালো তলোয়ার।

তথ্যসূত্র:

১. কালামে আমির
২. হযরত আমিরুল আউলিয়া শাহ্ সুফি সৈয়দ আমিরুজ্জমান শাহ্ (ক.) জীবনী ও কারামত
৩. দিওয়ান-ই-আযীয (ফার্সি-বাংলা), পৃষ্ঠা নং (৭৫-৭৬)

হযরত বাচা ফকির (ফতেপুর), বাচা বাবা (রাঙ্গুনিয়া) এবং সৈয়দ আবদুল আজিজ খিতাপচরী (রহ.)

♦ অ্যাডভোকেট আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইকবাল ♦

হযরত মাওলানা সৈয়দ বাঁচা মিয়া শাহ্ ফতেপুরী (১৮৫৫-১৯৪৯)

তিনি ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলার গড়দুয়ারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সৈয়দ জয়নুল আবেদীন আলী মিয়াজী প্রকাশ: জান আলী মিয়াজী এবং মাতা সৈয়দা সুফিয়া খাতুন। পিতা ও মাতার উভয় দিক হতে তিনি সৈয়দ তথা রাসূলুল্লাহ্ (দ.)-এর বংশধর। তাঁর পূর্বপুরুষগণ পবিত্র মক্কা নগরী হতে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এই উপমহাদেশে আসেন। তাঁরা চট্টগ্রামের চন্দনাইশ, রাউজানের চিকদাইর হয়ে শেষে হাটহাজারী উপজেলার গড়দুয়ারা গ্রামে বসতি স্থাপন করেন।

সৈয়দ জান আলী মিয়াজীর সন্তানগণের মধ্যে সাত কন্যা এবং একজন পুত্র। অর্থাৎ মাওলানা ফতেপুরী ছিলেন সাত বোনের এক ভাই। তাঁর সেজ বোন সৈয়দা রাহাতুন নেছার বিয়ে হয় হযরত কেবলা মাইজভাণ্ডারীর আপন ভাগিনা ও বিশিষ্ট মুরিদ রাউজান সর্তাস্থ চিকদাইর গ্রাম নিবাসী মাওলানা সৈয়দ কলিম উল্লাহ্ শাহ্ এর সাথে।

শৈশব থেকে মাওলানা ফতেপুরী তাঁর ভগ্নিপতি মাওলানা কলিম উল্লাহ্ শাহ্র সাথে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে হযরত আকদাসের খেদমতে আসা-যাওয়া করতেন। হযরত আকদাস তাঁকে খুব স্নেহ করতেন এবং আদর করে 'বাঁচা মিয়া' বলে ডাকতেন। পরবর্তীতে তাঁর পারবারিক দেওয়া নাম 'সৈয়দ আমিনুল হক', 'বাচা' নামের আড়ালে বিস্মৃত হয়ে যায়। তিনি নিজেই সবসময় 'বাচা মিয়া' নাম ব্যবহার করতেন।

শৈশব হতে তিনি ছিলেন ধীরস্থির ও তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী। শৈশবে পিতার কাছে পাঠ গ্রহণের মাধ্যমে তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু হয়। তাঁর দাদা মাওলানা সৈয়দ আছিহ্ উদ্দিন মিয়াজি গড়দুয়ারায় নিজ বাড়িতে বড় পুকুর পাড়ে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে পড়ার জন্য দূর-দূরান্ত হতে অসংখ্য ছাত্র আসত। মাওলানা ফতেপুরীর পিতাও সেখানে শিক্ষকতা করতেন। মাওলানা ফতেপুরীও এই মাদ্রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। পরবর্তীতে তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য মোহসেনিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে সেখান থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি জমাতে উলা পাশ করে কুরআন ও হাদিস শাস্ত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করেন। হযরত কেবলা মাইজভাণ্ডারীর (ক.) হুকুমে তিনি মাওলানা সৈয়দ গোলামুর রহমান প্রকাশ: বাবা ভাণ্ডারীর বড় বোন মুহতারিমা সৈয়দা আফি-উন-নেছা বিনতে মোশাররফ বিবির সাথে পরিনয় সূত্রে আবদ্ধ হন। আত্মীয়তার কারণে হযরত কেবলা মাইজভাণ্ডারী তাঁকে 'দুলহা' বলেও মাঝে মাঝে ডাকতেন। মাইজভাণ্ডারী পরিমণ্ডলে তিনি 'ফুফাজী' হিসেবে সর্বাধিক পরিচিত ছিলেন। প্রথম বিবির ইন্তিকালের পর তিনি চরকানাই এর মুন্সি খলিলুর রহমানের কন্যা মুহতারামা মোছাম্মৎ গুরন বিবিকে বিবাহ করেন।

পড়া-লেখা শেষ করে তিনি স্থানীয় মসজিদে ইমামতি ও ইসলামের প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে কাজ শুরু করেন। তিনি বিভিন্ন সমাজিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন। কিছুদিন এভাবে চলার পর হঠাৎ একদিন জুমার খোৎবা দেয়ার সময় তাঁর অবস্থার পরিবর্তন হয়। তিনি সেখান থেকে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ চলে যান। সেখানে হযরত কেবলা মাইজভাণ্ডারী তাঁকে আধ্যাত্মিক দীক্ষাদানে ধন্য করেন। দুইদিন পর হযরত কেবলা হুকুম করেন; তিনি যেন বার্মা গিয়ে (বর্তমান মায়ানমার) ত্বরিকতের কাজ করেন। এভাবে তিনি হযরত কেবলা মাইজভাণ্ডারী হতে ত্বরিকতের দীক্ষা ও খিলাফত লাভে ধন্য হন।

হযরত আকদাসের হুকুমে তিনি বার্মার উদ্দেশ্য রওনা করেন। সেখানে প্রায় দুই বৎসর অবস্থান করে বহু মুক্তিকামি মানুষকে 'মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার' সুধা পান করান। এরপর হযরত কেবলা মাইজভাণ্ডারীর রহস্যপূর্ণ হুকুমে পুনরায় মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ হয়ে নিজগ্রাম গড়দুয়ারায় চলে আসেন। তিনি গড়দুয়ারার উচ্চবংশীয়, শিক্ষিত ও সম্মানিত লোক হওয়ায় ত্বরিকত বিরোধীরা সরাসরি ত্বরিকতের কাজে বাধা দিতে সাহস করতোনা, কিন্তু রাতে বিশেষ করে সামা জিকির চলাকালীন সময় তারা ঢিল, পাথর এমন কি হাঁড়ি পাতিল ভর্তি ময়লা-

আবর্জনা ছুঁড়ে পালিয়ে যেত। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান ফতেপুর দরবার শরিফের এই জায়গাটি এক হিন্দু যোগীর কাছ থেকে ক্রয় করে মাটির ঘর নির্মাণ করা হয়। পরবর্তীতে তিনি ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে সুন্নাতে রাসূলের (দ.) এক্তেবায় মাওলার ইচ্ছায় আপন জন্মস্থান গড়দুয়ারা থেকে ফতেপুর গ্রামে হিজরত করেন। হযরত বাবা ভাণ্ডারী আধ্যাত্মিক সফরকালে একসময় হাটহাজারী আলাউল দীঘি পার্শ্বস্থ পুকুরে নামেন। মাওলানা ফতেপুরী সংবাদ পেয়ে দ্রুত সেখানে ছুটে যান। হযরত বাবা ভাণ্ডারী মাওলানা ফতেপুরীকে দেখেই তাঁর দুই হাত প্রসারিত করে দেন। মাওলানা ফতেপুরী ঐ অবস্থায় পুকুরে নেমে পড়েন। হযরত বাবা ভাণ্ডারী মাওলানা ফতেপুরীকে শতাধিক ডুব দেয়ান এবং হযরত কেবলার আপন মুখ মুবারক থেকে কবুলকৃত তবার্‌রুক মাওলানা ফতেপুরীকে খাইয়ে দেন। হযরত বাবা ভাণ্ডারীর সাথে তাঁর আত্মিক, আধ্যাত্মিক ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল সুদৃঢ়।

মাওলানা ফতেপুরী সামা (সাধন সঙ্গিত) খুব বেশি পছন্দ করতেন। অনেক সময় রাত-দিন বিরামহীন অজদে (ভাববিভোর) রত থাকতেন। মাঝে মাঝে তিনি সামা মাহফিলে ভাববিভোর অবস্থায় গায়ে পানি ঢালতে নির্দেশ দিতেন। তিনি আদবের কারণে মাইজভাণ্ডারী পরিমণ্ডলে বিশেষ খ্যাত ছিলেন। তিনি মাইজভাণ্ডার দরবারে প্রবেশ করলেই অন্যান্য ভক্ত-আশেকগণ সাথে সাথে একে অপরকে সজাগ করতেন যে, ফুফাজি এসেছেন, চলা-ফেরায় যেন কোন প্রকার বেয়াদবি প্রকাশিত না হয়। কারণ তিনি আদবের খেলাফ কোনকিছু একদম পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন, "আমার এইটা আদবের জায়গা, এখানে বে-আদবের কোন স্থান নাই।" তিনি হযরত কেবলা মাইজভাণ্ডারীর নির্দেশে সব সময় ঘোড়ায় চড়ে সফর করতেন।

তাঁর জীবন-যাপন ছিল সুশৃঙ্খল ও সুন্দর। তিনি মিষ্টিভাষী এবং অত্যধিক বাকপটুও ছিলেন। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে আন্দরকিল্লাহ্ শাহী জামে মসজিদের খতিব মাওলানা সৈয়দ আবদুল হামিদ বাগদাদি প্রকাশ সৈয়দ সাহেব আফিন্দির ভক্ত মুরিদানেরা ফতেপুর গ্রামে হাজী নূর আহম্মদ কোম্পানির বাড়িতে এক মাহফিলের আয়োজন করে। মাহফিলে যথাসময়ে হযরত সৈয়দ সাহেব উপস্থিত হন ও গ্রামের অনেক পুরুষ এবং মহিলাকে বাইয়াত প্রদান করেন। এক লোক তাঁকে বলেন, আমাদের গ্রামে মাওলানা ফতেপুরী নামে একজন বুজুর্গ লোক আছেন, তিনি গরু, মহিষ ও উট জবাই করে উরস করেন, গান বাজনা দ্বারা জিকির করেন, উনার নিকট সব নিয়ম-নীতি বিরোধী কাজ দেখা যায়– ইত্যাদি বলে সৈয়দ সাহেবকে রাগান্বিত করে তোলেন। সৈয়দ সাহেব তখন উপস্থিত সবাইকে ওয়াদা করান, যেন তারা মাওলানা ফতেপুরীর এই সমস্ত কাজে শরিক না হয়। ওয়াদা নেয়ার পর তিনি এক লোক মারফত মাওলানা ফতেপুরীকে একটি চিঠি দিয়ে তাতে লিখলেন, "আপনি কি আল্লাহ্‌র রাসূল (দ.)-কে চিনেন?" হযরত ফতেপুরী জবাবে লিখেন– "আবু জাহেল ও আবু লাহাব আল্লাহ্‌র রাসূল (দ.)-কে চিনত, কিন্তু আনুগত্য করত না, আর আমি আল্লাহ্‌র রাসূলের (দ.) আনুগত্য করি"। এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ জবাব পাওয়ার পর হযরত সৈয়দ সাহেব মাওলানা ফতেপুরীকে সৎ পথের পথিকদের পথপ্রদর্শক বলে স্বীকার করেন। কিন্তু ততক্ষণে মাহফিল শেষ হয়ে যায়। তাই যারা ওয়াদা করেছিল তারা সকলেই মাওলানা ফতেপুরীর নিকট আসা-যাওয়া বন্ধ করে দেয়। এই ঘটনার পর পরই গ্রামব্যাপী কলেরা-বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। এই রোগ এতই তীব্র ছিল যে, প্রতিদিন গড়ে প্রায় দশ/বার জন লোক মারা যেতে লাগল। তখন সবাই মাওলানা ফতেপুরীর নিকট দোয়া চাইতে আসলে তিনি বলেন, "আমাকে গ্রামের চতুর্দিকে ঘুরিয়ে আন"। তখন সকলে মাওলানা ফতেপুরীকে চেয়ারসহ গ্রামের চতুর্দিকে ঘুরিয়ে আনে। সাথে সাথে কলেরা বসন্ত রোগ বন্ধ হয়ে যায় এবং তখন থেকে আজ পর্যন্ত ফতেপুর গ্রামে আর একজন লোকও কলেরা-বসন্ত রোগে মারা যায়নি। মাওলানা ফতেপুরীর এরকম আরও অসংখ্য কারামত রয়েছে। তাঁর আরেকটি বিখ্যাত কারামত হলো, চকরিয়ায় মাতামুহুরী নদীর তেইক্কা চোরা খালের কাছে ভাঙ্গন স্থায়ীভাবে রোধ করণ। এখনো পর্যন্ত সেখানে আর নদী ভাঙ্গেনি। এভাবে তিনি বোয়ালখালির জৈষ্ঠপুরা গ্রামে ভাণ্ডারজুরীতেও নদীর ভাঙ্গন কারামতের মাধ্যমে স্থায়ীভাবে রোধ করেন।

মাওলানা সৈয়দ আজিজুল হক শেরে বাংলা তাঁর বিখ্যাত 'দিওয়ান-ই আযীয' গ্রন্থে মাওলানা ফতেপুরী সম্পর্কে উচ্চ প্রশংসা করেছেন। মাওলানা সৈয়দ আজিজুল হক তাঁকে আরেফে কামেল, সাহেবে জালাল ওয়া জামাল, পেশওয়ায়ে আরেফা, মাসদারে কারামাত, মাদিনে ফুয়ুজাত, সাহেবে মাকামাত বলে উল্লেখ করেছেন।

তিনি হযরত কেবলা মাইজভাণ্ডারী হতে লাঠি, নালাইন (চটিজুতা মোবারক) ও হযরত বাবা ভাণ্ডারী হতে দন্দান (দাঁত), চাদর ও চুল মোবারক তাবার্‌রুকাত হিসেবে লাভ

করেন। এগুলো তাঁর মাযারের শিরোপরে সমাধিস্থ করে রাখা হয় তাঁর আধ্যাত্মিক নির্দেশে। তিনি হযরত কেবলা মাইজভাণ্ডারীর বেসালের সময় পাশে উপস্থিত ছিলেন। তিনি প্রতি বছর ৯ মাঘ হযরত কেবলা মাইজভাণ্ডারীর উরস পালন করতেন।

তিনি ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ২৪ সেপ্টেম্বর ৭ আশ্বিন ১০ জিলহজ দিবাগত রাত ১২টা ১ মিনিটে ইন্তিকাল করেন। মাওলানা ফতেপুরী ছয় পুত্র ও পাঁচ কন্যা সন্তানের জনক ছিলেন। তাঁর পুত্রগণ হলেন– সৈয়দ নুরুল আলম ফতেপুরী (তিনি তাঁর জীবদ্দশায় ইন্তিকাল করেন), সৈয়দ নুর আহম্মদ ফতেপুরী, সৈয়দ নুরুল বশর ফতেপুরী, সৈয়দ নুরুচ্ছাফা ফতেপুরী, সৈয়দ নুরুল ইসলাম ফতেপুরী (১৯১৬-১৯৯৫) এবং সৈয়দ নূরুল হুদা ফতেপুরী। আর কন্যাগণ হলেন– সৈয়দা গুল আফরোজা (স্বামী– সৈয়দুর রহমান), সৈয়দা সামশুন নাহার (মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের খালেক মন্‌জিলে বিবাহ হয়, তিনি সৈয়দ আবু আহমদ মাইজভাণ্ডারীর মাতা), সৈয়দা নাজমুন নাহার, সৈয়দা হেলাল বেগম এবং সৈয়দা দিল আফরোজ বেগম।

তাঁর অসংখ্য দীক্ষাপ্রাপ্ত খলিফা রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে– ১. মাওলানা সৈয়দ অছিয়র রহমান সাওমি ফতেয়াবাদি, (তিনি ফতেপুরীর মেঝ বোন সৈয়দা শরফুন নেছা এবং মাওলানা সৈয়দ আবদুল লতিফ শাহ্ আল কাদেরির পুত্র। তাঁর সহোদর মাওলানা সৈয়দ আবু নোমান সিরাজুর রহমান ভারতের নদীয়াতে 'বেলতলা হাই মাদ্‌রাসা' প্রতিষ্ঠা করেন। সারা বছর রোযা পালন করতেন বলে তাঁকে সাওমি বলা হতো। ঢাকা, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জে তাঁর অসংখ্য মুরিদ রয়েছে। তিনি মাজ্‌জুব প্রকৃতির অলি আল্লাহ্ ছিলেন।) ২. মাওলানা সৈয়দ ছগির আহমদ (দোহাজারী দরবার শরিফ), ৩. মাওলানা বেলায়েত হোসেন (চুনতি), ৪. ডা. আহমদুর রহমান (রহমানিয়া দরবার শরিফ, কাঞ্চননগর, চন্দনাইশ। তিনি হযরত বাবা ভাণ্ডারীর কাছ থেকেও আধ্যাত্মিক দীক্ষা লাভ করেন।), ৫. সোলাইমান খাঁ (হারবাং), ৬. লেদু মিয়া খাঁ (হারবাং), ৭. আবদুল হামিদ খাঁ (হারবাং), ৮. মাওলানা আবদুর রহমান প্রকাশ: সমুদার বাপ (করুলডাঙ্গা, বোয়ালখালী), ৯. মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রিস (জৈষ্ঠপুরা, বোয়ালখালী) অন্যতম। এছাড়া আমির ভাণ্ডার দরবার শরিফের মাওলানা ডা. সৈয়দ মোজাহেরুল হক শাহ্, হাফেজনগর দরবার শরিফের মাওলানা হাফেজ সৈয়দ ফজলুর রহমান হাফেজনগরি, মাওলানা সৈয়দ ফজলুল হক হাফেজনগরির সাথে তাঁর আধ্যাত্মিক হৃদ্যতাপূর্ণ ও স্নেহসুলভ সম্পর্ক ছিলো।

দক্ষিণ চট্টগ্রাম, কক্সবাজার জেলা ও বার্মায় তাঁর অসংখ্য ভক্ত-মুরিদ ছিলো। এই অঞ্চলে মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার প্রচার প্রসারে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

সূত্র:
১. সৈয়দ মা'মুর উশ শহীদ, হাকিম-এ বেলায়ত সৈয়দ বাঁচা মিয়া শাহ্ ফতেপুরী (র), (চট্টগ্রাম: শাহজাদা সৈয়দ মুজিবুল হক ফতেপুরী, ২০২২)
২. সৈয়দ আজিজুল হক শেরে বাংলা আল কাদেরী, দিওয়ান-ই আযীয, (চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ: প্রবি, ২০১২)।
৩. গবেষকের সাথে মাওলানা ফতেপুরীর বংশধর শাহজাদা সৈয়দ মুজিবুল হক ফতেপুরীর সাক্ষাতকার, (চট্টগ্রাম, ১২ জুন ২০২৫)
৪. মাসিক আলোকধারা, অক্টোবর ২০১৩ ঈসায়ী সংখ্যা, পৃ.৪৫-৪৬।

হযরত সৈয়দ সোলতান উদ্দীন প্রকাশ বাচা মিয়া (১৮৪২-১৯৫৩)

বাচা বাবা, বাচা ফকির চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া পৌরসভার ২নং ওয়ার্ডের পোমরা, কাউখালী সিরাজ শহর (মহত্তরখীল)-এ জহর আলী মিসকিন শাহ্ এর ঘরে ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতাও একজন কামেল অলি-আল্লাহ্ ছিলেন। তিনি ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে হযরত কেবলা গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর একনিষ্ঠ মুরিদ ও খলিফা মাওলানা সৈয়দ ছালেকুর রহমানের সাথে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ গমন করেন এবং তথায় গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র কৃপাদৃষ্টি ও ফয়েজ বা আধ্যাত্মিক দীক্ষা লাভে ধন্য হন। কারো মতে তিনি হযরত কেবলা আলমের অন্যতম খলিফা হযরত মাওলানা জনাব কাজী আসাদ আলী (রহ.)'র (ইন্তিকাল ১৯১৫) সান্নিধ্য লাভ করেন এবং তাঁর মাধ্যমেই মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে গমন করেন। এরপর থেকে তাঁর অবস্থার পরিবর্তন হয় এবং তিনি মাজজুব হালতে কঠোর রিয়াজত শুরু করেন। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের গভীর জঙ্গলে একাধারে ৩৬ বছর ইবাদতে মশগুল থেকে নিজ গ্রামে ফিরে আসেন। তাই তিনি বলতেন, "আমি ৩৬ বছর মক্কা-মদিনা ঝাড়ু দিয়ে বেলায়ত পেয়েছি।" তিনি ছিলেন হযরত কেবলা মাইজভাণ্ডারীর অন্যতম খলিফা। বাড়ি ফিরে তিনি দেখতে পান তাঁর পৈত্রিক ভিটেটিতে সরকার একটি হাসপাতাল স্থাপন করেছে। পরবর্তী সময়ে তাঁর কারামত প্রকাশিত হলে সরকার বাধ্য হয়ে হাসপাতালটি অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে তাঁর পৈত্রিক ভিটে তাঁকে ফিরিয়ে দেয়। বর্তমানে

সেখানেই তাঁর মাযার সৌধ নির্মিত হয়েছে। তিনি দুইটি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং এক পুত্র সন্তানের জনক ছিলেন বলে জানা যায়। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারি, বাংলা ফাল্গুন মাসের ২ তারিখ, শনিবার দিবাগত রাত ২.৫৫ মিনিটে তিনি ইন্তিকাল করেন। ইন্তিকালের সময় তিনি তাঁর ভক্ত নুরুল ইসলামকে বলেন, 'তুমি সূরা ইয়াছিন পাঠ কর।' নুরুল ইসলাম তা পাঠ করতে শুরু করেন। একটু পর ভক্ত নুরুল ইসলাম তাঁর শরীরের কাছে কান নিয়ে স্পষ্ট শুনতে পান তাঁর সমস্ত শরীর থেকে যিকিরের শব্দ আসছে। তার কিছুক্ষণ পর তিনি ইন্তিকাল করেন।

তাঁর সেই ভিটায় মাযার, মসজিদ, মহিলাগণের ইবাদত খানা, মুসাফির খানা, লঙ্গর ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো 'বাচা বাবা শাহেন শাহ্ (র.) ওয়াক্ফ এস্টেট' এর অধীনে পরিচালিত হয়। তিনি জীবদ্দশায় প্রতি বাংলা সনের ১৫ মাঘ উরসের আয়োজন করতেন। সম্ভবত এটা হযরত কেবলা মাইজভাণ্ডারীর ১০ মাঘ উরস শরিফ উদযাপনের জন্যই করা হতো। এছাড়াও বর্তমানে প্রতি বছর ১৯ পৌষ তাঁর খোশরোজ বা জন্মবার্ষিকী এবং ২রা ফাল্গুন তাঁর বার্ষিক উরস পালন করা হয়। তাঁর উরসে লক্ষাধিক ভক্ত-আশেক উপস্থিত হন। এছাড়াও প্রতিদিন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জায়েরিন তাঁর মাযার জেয়ারতে আসেন। তাঁর অসংখ্য কারামতের কথা জানা যায়।

মাওলানা সৈয়দ আজিজুল হক শেরে বাংলা (র.) তাঁর বিখ্যাত 'দিওয়ান-ই আযীয' গ্রন্থে বাচা ফকির সম্পর্কে উচ্চ প্রশংসা করেছেন। তিনি তাঁকে মাজ্জুবে সালিক, কাশ্ফ-কারামাতের ধারক ও আহলে সাফা (পরিচ্ছন্ন আত্মার অধিকারী) বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর সম্পর্কে ভক্ত-আশেকগণও অনেক কালাম রচনা করেছেন। যেমন: আমার কিসের দুঃখ ভয় রে, আমার কিসের বিপদ ভয়/ আমার মুর্শিদ বাচা বাবা বড় দয়াল প্রেমময়/ আল্লা যারে দয়া করে, বাচা তারে পেয়ার করে/ আবার বাচার পেয়ারার প্রতি জান, আল্লা সদা দয়াময়।", "বাচার দয়া অন্তহীন/ বাবার খালি হাতে ফিরায় না গো কারে কোন দিন/ তাঁহায় রাজি করে আজি কত পাপী জনে মুক্তি পায়/ আমার বাচা দয়াল উদয় হল আখের জামানায়।" এরকম আরো অনেক কালাম তাঁর মাযার কমপ্লেক্সের বিভিন্ন স্থানে খচিত করে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

সূত্র:

১. সৈয়দ আজিজুল হক শেরে বাংলা আল কাদেরী, দিওয়ান-ই আযীয, (চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ: প্রবি, ২০১২)।

২. স.ম.জিয়াউর রহমান, সুলতানুল আরেফিন হযরত সোলতান উদ্দীন বাচা বাবা (র.), মাসিক আলোকধারা, ফেব্রুয়ারী ২০০১ সংখ্যা।

৩. গবেষকের সরেজমিন জরীপ।

মাওলানা সৈয়দ আবদুল আজিজ খিতাপচরি (১৮৫১-১৯৩১)

চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী উপজেলার খিতাপচর গ্রাম নিবাসী মাওলানা সৈয়দ আবদুল আজিজ খিতাপচরি হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর প্রথম খলিফা মাওলানা শেখ অছিয়র রহমান প্রকাশ: মাওলানা আকদাস চরণদ্বিপির বাল্য বন্ধু, সহপাঠি ও বেয়াই ছিলেন। তিনি ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে খিতাপচরের সৈয়দ পরিবারে মাওলানা সৈয়দ আকবর আলীর ঘরে কোন এক সোমবার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা উভয়ে বাল্যকালে খরণদ্বীপ নিবাসী মাওলানা সুফি সৈয়দ আতাহার আলী খরণদ্বিপির নিকট প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি উচ্চ শিক্ষা অর্জনের জন্য ভারতের বিখ্যাত দেওবন্দ ও দিল্লী আলিয়া মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন শেষে গোল্ড মেডেল এবং 'বাখিরাতুল উলুম' উপাধি লাভ করে মাওলানা সৈয়দ আবদুল আজিজ খিতাপচরি ভারতেই শিক্ষকতায় আত্মনিয়োগ করেন। কারো মতে তিনি দেওবন্দ মাদ্রাসায়ও শিক্ষকতা করেন। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের পর তিনি দেশে ফিরে আসেন। ভারত থেকে তিনি সাতটি বড় বড় বাক্সে করে কিতাব নিয়ে আসেন। বাড়ি ফিরে তিনি জানতে পারেন, তাঁর বাল্যবন্ধু মাওলানা চরণদ্বিপি সামা ও বাদ্য বাজনায় ডুবে আছে। তিনি তাড়াতাড়ি তাঁর বন্ধুর বাড়ি যান। তাঁকে দেখে মাওলানা চরণদ্বিপি সাদরে বরণ করেন। কিন্তু তিনি রাগান্বিত অবস্থায় ছিলেন বলে প্রথমেই সামা-বাদ্য বাজনা বিষয়ে প্রশ্ন করা শুরু করেন। তখন মাওলানা চরণদ্বিপি তাঁকে হাসতে হাসতে বলেন, আপনার এই প্রশ্নের উত্তর দিবেন আমার পির-মুর্শিদ হযরত কেবলা মাইজভাণ্ডারী, তাই আপনি সেখানেই যান। তাঁর এই উত্তর পেয়ে মাওলানা খিতাপচরি ৪০ জন সঙ্গি আলেম নিয়ে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ গমন করেন। তাঁকে দেখার সাথে সাথে হযরত কেবলা মাইজভাণ্ডারী জজ্বা হালতে চলে যান এবং তাঁর হাতের বদনাটি তাঁর মাথায় ছুঁড়ে মারেন। ফলে তাঁর মাথা ফেটে যায়।

একই সময় তাঁর ঘরে রক্ষিত সাত বাক্স কিতাবও হঠাৎ আগুনে পুড়ে যায়। তখনই তিনি হযরত কেবলা মাইজভাণ্ডারীর বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং ত্বরিকত চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। পরবর্তীতে তিনি হযরত কেবলা মাইজভাণ্ডারী হতে খিলাফত লাভে ধন্য হন।

হযরত কেবলা মাইজভাণ্ডারীর নির্দেশে চট্টগ্রাম হতে উত্তর দিকে সাধনার যাত্রা শুরু করেন। তিনি ১২ বছর চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড পাহাড় এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ার গোপীনাথপুরের নিকটস্থ পাহাড়ে রেয়াজত করেন। এছাড়াও তিনি ফেনী, নোয়াখালী, চাঁদপুর, ঢাকা, সিলেট, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বর্তমান ভারতের আগরতলা, ত্রিপুরায় কঠোর রিয়াযত ও মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার প্রচার-প্রসারের কাজ করেন। তাঁর মাধ্যমে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মানুষ সঠিক দিশা লাভ করে, স্রষ্টার প্রেমে বিভোর হয়। এইসব অঞ্চলে তাঁর অসংখ্য ভক্ত-মুরিদ ছিল। গোপীনাথপুরে মাওলানা খিতাপচরির শতবর্ষী খানকাহ্‌টি এখনো বর্তমান আছে। এছাড়াও মঙ্গলপুর, মাধবপুরেও তাঁর খানকাহ্‌ আছে। আধ্যাত্মিক দীক্ষা লাভ করে যাঁরা তাঁর যোগ্য খলিফা হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন তাঁদের মধ্যে– ১. মাওলানা বুলবুলে ফকির নোয়াব শাহ্‌ প্রকাশ: বিসমিল্লাহ্‌ শাহ্‌, গোপীনাথপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ২. মাওলানা ইউনুস খাঁ, গোপীনাথপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ৩. মাওলানা শামসুর রহমান চৌধুরী প্রকাশ: শামসু ফকির, মাধবপুর, হবিগঞ্জ, ৪. মাওলানা ফকির তমিজ উদ্দিন, মাধবপুর, হবিগঞ্জ, ৫. মাওলানা নাদিরুজ্জামান শাহ্‌ প্রকাশ: জুলফিকার হায়দার, কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ৬. মাওলানা গোলাম কারি, নারিন্দা, ঢাকা-অন্যতম। তিনি দীর্ঘ সময় ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও হবিগঞ্জে অবস্থান করেন।

মাওলানা খিতাপচরি সৈয়দা সয়া বিবির সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি চার পুত্র ও দুই কন্যা সন্তানের জনক ছিলেন। তাঁর পুত্রগণ হলেন– সৈয়দ সুলতান আহমেদ খিতাপচরি, সৈয়দ সিদ্দিক আহমেদ খিতাপচরি, খাজা সৈয়দ ইউসুফ আহমেদ খিতাপচরি (ইন্তিকাল: ১৯৭৮), সৈয়দ নুরুল ইসলাম খিতাপচরি। তাঁর কনিষ্ঠ কন্যার নাম সৈয়দা ফাতেমা খাতুন। সৈয়দা ফাতেমা খাতুনের স্বামী ছিলেন মাওলানা শেখ আবুল বশর ফারুকি চরণদ্বিপি। তাঁর বিবাহ সম্পর্কে মাওলানা আকদাস চরণদ্বিপি তাঁদের জন্মের পূর্বেই ভবিষ্যদ্বাণী করেন। সৈয়দা ফাতেমা খাতুনের মাযার খিতাপচরেই অবস্থিত।

মাওলানা খিতাপচরির বাড়িতে অসংখ্য বিখ্যাত শায়খ আগমন করেছেন। তাঁদের মধ্যে হযরত কেবলা মাইজভাণ্ডারীর খলিফা মাওলানা শেখ অছিয়র রহমান চরণদ্বিপি, মাওলানা জনাব কাজি আসাদ আলী, মাওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী অন্যতম।

দেওয়ানে আজিজে মাওলানা সৈয়দ আজিজুল হক শেরে বাংলা মাওলানা খিতাপচরিকে রাহবারে সালেকা বা সালেকগণের পথপ্রদর্শক, আলিমকুলের শিরোমনি, যুগ প্রসিদ্ধ বুযুর্গ বলে উল্লেখ করেছেন।

মাওলানা খিতাপচরির দোয়ায় তৎকালীন আগরতলার মানিক্য রাজবংশের রাজার মাতা সুস্থতা লাভ করেন। প্রাপ্ত তথ্যের সমন্বয় করে অনুমান করা যায় সেই রাজা ছিলেন মহারাজ রাধা কিশোর মানিক্য (শাসনকাল: ১৮৯৭-১৯০৯) এবং তার মাতা ছিলেন রাণী মনোমোহিনী। এতে রাজা খুশি হয়ে তাঁকে একটি পালঙ্ক উপহার দেন। কিন্তু মাওলানা খিতাপচরি তা তাঁর মুর্শিদ হযরত কেবলা মাইজভাণ্ডারীর দরবারে পাঠিয়ে দিতে রাজাকে অনুরোধ করেন। রাজা তাঁর কথামতো তা মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে হযরত কেবলা মাইজভাণ্ডারীর কাছে পৌঁছে দেন। হযরত কেবলা মাইজভাণ্ডারী কিছু সময় তা নিজ আসন শরিফ হিসেবে ব্যবহার করে তা আবার মাওলানা খিতাপচরির বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। মাওলানা খিতাপচরি জীবদ্দশায় প্রায় সময় নিজ আসনে বসে এই আসন শরিফের দিকে তাকিয়ে থাকতেন আধ্যাত্মিক ভাববিভোর হয়ে। তাঁর ইন্তিকালের পর থেকে পালঙ্কটি তাঁর মাযারের শিয়রের কাছেই আছে। প্রতিদিন অসংখ্য জায়েরিন তাঁর মাযার ও হযরত কেবলা মাইজভাণ্ডারীর আসন শরিফটি জেয়ারত করতে আসেন।

তিনি ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। প্রতি বছর বাংলা সনের ২৬ পৌষ তারিখ তাঁর বার্ষিক উরস পালন করা হয়। তাঁর অসংখ্য করামতের কথা জানা যায়।

সূত্র:

১. মাওলানা খিতাপচরি বংশধর সৈয়দ সাহাব উদ্দীন, মাওলানা সৈয়দ শাহিনুর আজিজ ও সৈয়দ হারিস আহমেদের সাক্ষাতকার, (চট্টগ্রাম: ১১ জুন ২০২৫)।

২. মৌলভী মোহাং আবদুল মোনায়েম খাঁন, কুতুবুল আকতাব মৌলানা শাহ্‌ সুফি শেখ অছিয়র রহমান আল ফারুকী (ক:): জীবনী ও কারামত, ২য় সংস্করণ, (চট্টগ্রাম: আবু মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ ফারুকী, ২০০১)।

৩. সৈয়দ আজিজুল হক শেরে বাংলা আল কাদেরী, দিওয়ান-ই আযীয, (চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ: প্রবি, ২০১২)।

৪. মাসিক আলোকধারা, জানুয়ারি ১৯৯৯ সংখ্যা, পৃ. ৩।

নৈতিকতা, রাজনীতি এবং ইসলাম : একটি সমীক্ষা

♦ জাবেদ বিন আলম ♦

(শেষ পর্ব)

মদিনা সনদের আলোকে প্রবর্তিত খোলাফায়ে রাশেদীনের মতো অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক এবং রাষ্ট্রিক সুব্যবস্থা ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ কাঠামোর নজির বিশ্ব ইতিহাসে এখনো পরিলক্ষিত হয়নি। খোলাফায়ে রাশেদীন প্রতিষ্ঠাকালে সমকালীন সমাজে চলমান বংশীয় অথবা পারিবারিক উত্তরাধিকার নীতি পরিহার করে জনসম্মতি ভিত্তিক খিলাফত গড়ে তোলা হয়। তখনো আরব জুড়ে গোত্রপতি নীতি কার্যকর ছিল। গোত্র প্রধানও বংশীয় উত্তরাধিকার ভিত্তিতে মনোনীত হতেন না। গোত্র প্রধান নির্বাচিত হতেন গোত্র সদস্যদের সম্মতিক্রমে। যে কোন সিদ্ধান্ত কার্যকরের বিষয়ে গোত্রের প্রভাবশালী সদস্যদের মতামত গ্রহণ করা হতো। গোত্রের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক ব্যতীত কখনো বাইরের কোন ব্যক্তিকে গোত্র পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা হতো না। ইসলাম ধর্ম প্রচারের প্রাক্কালে বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ (দ.) বিভিন্ন রাজা-বাদশাহদের নিকট প্রেরিত দাওয়াত পত্রের মতো আরবের বিভিন্ন গোত্র প্রধানদের জন্যেও দাওয়াতনামা প্রেরণ করেছিলেন। এটি সমাজ সংহতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান কার্যকরের ঐশী তাগিদের অপরূপ নমুনা। মদিনা সনদ ঘোষণার পর মদিনা সাধারণতন্ত্র পরিচালনা এবং কর উত্তোলন বিষয়ে কাল্‌ব গোত্রের প্রতিনিধি মনোনয়নের ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় এবং উপযুক্ত কেউ না থাকায় আশারায়ে মোবাশ্‌শারা সদস্য হযরত আবদুর রহমান বিন আউফকে মনোনীত করা হয়। বৈবাহিক সূত্রে হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ ছিলেন কাল্‌ব গোত্র প্রধান আল-আসবাগ বিন আমর আল কাল্‌বীর কন্যা তুমাযির স্বামী। মদিনা সাধারণতন্ত্র পরিচালনা এবং প্রতিনিধি মনোনয়নের ক্ষেত্রে হুজুর (দ.) এক গোত্রের উপর অন্য গোত্রের কর্তা নিয়োগ করে আধিপত্য বিস্তার এবং প্রভাব সৃষ্টির প্রচেষ্টা পরিহার করেছেন। অর্থাৎ হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ আয-যুহরী ছিলেন কাল্‌ব গোত্র প্রধানের জামাতা। (সুত্রঃ রাসুল মুহাম্মদ (দ.)-এর সরকার কাঠামো: অধ্যায়, আরবে ইসলাম বিস্তার; পৃষ্ঠা-৯৪, ড. মুহাম্মদ ইয়াসীন মাযহার সিদ্দিকী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)। মদিনা সনদে ঘোষিত বিধানের আওতায় কোরাইশ ও ইয়াসরিবের মুসলমান ও বিশ্বাসীগণ গোত্রীয় জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা করবে। কোন দলই গোপনে অন্য কোনো দলে যোগ দেবে না। কোন বিশ্বাসী অন্য বিশ্বাসীকে বধ করবে না। কোনো বিশ্বাসীর বিরুদ্ধে অন্যকোন অবিশ্বাসীকে সাহায্য করবে না। কেউ কারও ধর্মে বা ধর্মপালনে আঘাত করবে না। কারও ব্যক্তিগত পাপে তার গোষ্ঠী শাস্তি পাবে না। মদিনাতে রক্তপাত হবে না। সকলেই আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র নবির অনুশাসন মেনে চলবে।

তৎসময়ে মদিনায় বসবাসরত সংখ্যাগরিষ্ঠ ইহুদী ধর্মানুসারীদের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তিপত্রের একটি শর্ত ছিল, "তবে এই সন্ধি স্বাক্ষরকারীগণ স্বাক্ষরকারীগণ সকলকে ভালো কথায় ভালো কাজে পারস্পরিক বন্ধুত্বে স্বাক্ষর ছাড়া একে অপরকে সাহায্য করবে। যুদ্ধের সময় ইহুদীগণ মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ খরচ বহন করবে। সন্ধিপত্রের স্বাক্ষরকারীগণ দ্বারা ইয়াসরিবের মন্দিরাদির সীমানা স্থানগুলোর ও ইয়াসরিবের পবিত্রতা রক্ষিত হবে। প্রতিবেশিগণ একে অন্যের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে। অনুমতি ব্যতীত অনকোন নারীকে গ্রহণ করবে না। কোরাইশগণকে (এরা মদিনা সাধারণতন্ত্র ধ্বংস করার লক্ষ্যে যুদ্ধে লিপ্ত) কেউ কোন প্রকার সাহায্য করবে না বা কোরাইশদের সাহায্যকারীদেরও নয়। যদি কেউ ইয়াসরিবকে আক্রমণ করে তখন সকলেই একত্রিতভাবেই প্রতিরোধ করবে। যখন তারা সন্ধির জন্য একত্রিত হবে– তখন একে অন্যকে সংবাদ দেবে, পরামর্শ করবে। যদি সন্ধি সম্পর্কে কোন সন্দেহ দেখা দেয় তখন তা মীমাংসার জন্যে আল্লাহ্‌র রাসুলের কাছে পাঠানো হবে; –(মহানবি : ড. ওসমান গনী: মহানবি ও অন্যান্যদের মধ্যে সন্ধিপত্র, পৃষ্ঠা ২৫০-২৫১)। ইসলামে বর্ণিত সিয়াসত তথা রাষ্ট্র ব্যবস্থা মূলত কুটিলতা, দ্বিচারিতা, অশালীনতা, বৈরিতা, প্রতিশোধ-প্রতিহিংসা সর্বোপরি ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে উগ্রপন্থা, ধোকাবাজিকে কখনো প্রশ্রয় দেয়নি। খোলাফায়ে রাশেদীন যে কোন প্রকারের বর্বরতা এবং ঈর্ষা, হিংসা, বিদ্বেষ থেকে মানুষের অন্তরকে পবিত্র রাখার শপথে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসুলের প্রতি অনুগত ও অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন। তারা পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা এবং আস্থাশীল ছিলেন বাক্য কর্ম সততার মাধ্যমে। খোলাফায়ে রাশেদীনের অন্তর্মুখি ভিন্নমত যখন চরম বিরোধে রূপ নেয় তখন কেউ তা কামনা না করলেও চরম বিষাদঘন রক্তাক্ত অধ্যায়ের পথে অগ্রসর হয়। ফলে আল কোরআনের আলোকে পরিচালিত পরিশীলিত ইজতিহাদ ভিত্তিক, ন্যায়পরায়ণ ও কল্যাণমুখি রাষ্ট্র পরিচালনা ব্যবস্থারও অবসান ঘটে। উল্লেখ্য, খোলাফায়ে রাশেদীনের অবসানের পর পর মদিনা সনদের লিখিত কপিও এক পর্যায়ে গায়েব হয়ে যায়। তবে উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা.)'র নিকট রক্ষিত কপি পরবর্তী সময়ে ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে গবেষকরা উপস্থাপন করেছেন। বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ (দ.) প্রণীত দলিল গায়েব হওয়া উম্মাহ্‌র জন্যে সুখকর সংবাদ নয়। এর ফলে ধীরে ধীরে উম্মাহ্‌র অভ্যন্তরে মতভেদ বাড়তে থাকে। তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা.)'র সহজ-সরল চারিত্রিক সৌন্দর্যের সুযোগ গ্রহণ করে অর্থ-বিত্তে প্রভাবশালী উমাইয়ারা গোত্রবাদী চিন্তায় নিজেদেরকে সংহত করে ক্ষমতার ভরকেন্দ্রে উপস্থিত হতে থাকে। বিষয়টি অনেকাংশে দৃষ্টিকটু ছিল। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে এ ধরনের ঘটনা সন্দেহ-সংশয়ের সৃষ্টি করে। এছাড়া দূর অতীত থেকে কোরাইশদের সবচেয়ে শক্তিশালী হাশেমী এবং উমাইয়াদের প্রভাবজনিত দ্বন্দ্ব নবরূপে প্রকাশ পেতে থাকে। শুরু হয় পারস্পরিক অবিশ্বাস, অনাস্থা, মতবিরোধ,

সিয়াসতের স্পর্শকাতর বিষয়সমূহ সরাসরি ফিত্না-ফেরকায় রূপ নেয়। হযরত উসমান (রা.)'র শাহাদাত উম্মাহ্র অভ্যন্তরে অবারিত রক্ত স্রোতের উদ্বোধন ঘটায়। হুজুর (দ.) স্বয়ং হযরত উসমান (রা.)'র শাহাদাত সম্পর্কে উম্মাহ্কে সতর্ক করে উল্লেখ করেছিলেন, "যে দিন উসমান নিহত হবে, সেদিন তোমাদের জন্যে ধ্বংস" –(খাসায়েসুল কুবরা-২য় খণ্ড)। উল্লেখ্য, হযরত উসমান (রা.)'র শাহাদাত সার্বিক অর্থে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সিয়াসত সম্পর্কিত পারস্পরিক অনাস্থারই রক্তাক্ত অধ্যায়ের প্রতিফলন।

হযরত উসমান (রা.)'র শাহাদাতের পর বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরাম খিলাফতের দায়িত্ব পালনে ব্যাপকভাবে অনাগ্রহী হয়ে উঠেন। পুণ্যবান খলিফার শাহাদাতের পর ইসলাম ধর্মের অনন্য পুণ্যভূমি মদিনা নগরী জুড়ে বিদ্রোহীদের উন্মত্ত-উগ্র আচরণ কেউ মেনে নিতে পারেননি। সকলের মধ্যে এক ধরনের বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে, শুধু মাত্র 'ক্ষমতা'র প্রত্যাশায় রাসুল করিম (দ.)'র পরম নৈকট্যপ্রাপ্ত সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের মধ্যে কলহে জড়িয়ে পড়েছেন। বিষয়টি অনেকের নিকট নৈতিকতার সংকট হিসেবে প্রতিভাত হতে থাকে। এ পর্যায়ে অনেক সাহাবা সিয়াসতী ফিত্না থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখতে সচেষ্ট হন। হযরত উসমান (রা.)'র শাহাদাতের পর উম্মাহ্র অভ্যন্তরে বিভক্তি প্রকাশ্য রূপ নেয়। আশারায়ে মোবাশ্শারা সদস্য হযরত তালহা এবং যুবায়ের (রা.) উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-কে সামনে রেখে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবি জানিয়ে মক্কা থেকে বসরা অভিমুখে যাত্রা করেন। অন্যদিকে উম্মাহ্র চরম সংকট এবং বিভেদের সময় অনেকাংশে সাহাবায়ে কেরামের চাপের মুখে বাধ্য হয়ে হযরত আলী (রা.) খিলাফত পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। খিলাফতের রাজধানী মদিনা জুড়ে চলমান অরাজকতা এবং সর্বত্র বিরাজমান অস্থিরতা, শংকা এবং নিরাপত্তাহীনতা সামাল দেয়া তখন নব-নিযুক্ত খলিফার প্রধান দায়িত্ব এবং কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্যে অত্যাবশ্যকীয় ধৈর্য এবং সুস্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুকূলে পর্যাপ্ত সহযোগিতা অনেক প্রধান সাহাবার নিকট থেকে হযরত আলী (রা.) পেয়েছেন বলে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। সর্বত্রই যেন পারস্পরিক সন্দেহ ঘনীভূত হতে থাকে। এ ধরনের সন্দেহ অবিশ্বাসের মুখে ইসলামী খিলাফতের সম্মুখে অগ্রবর্তী–'কুটিলপন্থা'– যা ক্ষমতাকেন্দ্রিক দ্বন্দ্ব 'রাজনীতি' নামে আবির্ভূত হয়। পরম আবেগ এবং অস্থির চিত্তের মনোবাসনার সুযোগে একটি অদৃশ্য চক্র রাজনীতির খেলোয়াড় হিসেবে মাঠে নেমে পড়ে। একদিকে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.), হযরত তালহা (রা.) এবং হযরত যুবায়ের (রা.)'র নেতৃত্বে প্রভাবশালী অনেক সাহাবা, অন্যপক্ষে খলিফা হযরত আলী (রা.) এবং অসংখ্য হকপন্থী সাহাবার সমন্বয়ে সংঘটিত বিশ্বস্ত অনুগামীদল অনাকাঙ্ক্ষিত সমরের মুখোমুখি হন। উভয়পক্ষে নিশ্চিতভাবে ক্ষমতালোলুপ দুষ্টচক্রের জটিল অবস্থান ছিল স্পষ্ট-অস্পষ্টতায় ভরপুর। এ স্তরের লোকদের ভণ্ডামি, কপটতা এবং ধূর্ত আচরণ আবেগ-উত্তেজনা মুহূর্তে যাচাই করা দুরূহ ছিল। ফলে গভীর রাতে বসরার হওর এলাকার রণপ্রান্তরে খলিফা হযরত আলী (রা.), হযরত তালহা (রা.) এবং হযরত যুবায়ের (রা.)'র মধ্যে অনুষ্ঠিত অতি গোপনীয় একান্ত বৈঠকের শান্তিপূর্ণ সমাঝোতার পরস্পরিক অঙ্গীকার উভয় পক্ষে সদাসক্রিয় থাকা অদৃশ্য গুপ্তচক্রের নিশিরাতের ষাড়াশি আক্রমণে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। রণপ্রান্তরে শান্তির সম্ভাবনার যে দুয়ার উন্মুক্ত হয়েছিল তা ধ্বংসের অনুঘটক হচ্ছে 'রাজনীতি'।

খলিফা হযরত আলী (রা.) এবং উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.), হযরত তালহা (রা.), হযরত যুবায়ের (রা.)'র মধ্যে সংঘটিত উষ্ট্রের যুদ্ধে উভয়পক্ষে অসংখ্য সাহাবা প্রাণ হারান। হযরত তালহা এবং যুবায়ের (রা.)'র মতো সুউচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবা শহিদ হন। এ ধরনের আত্মঘাতী ঘটনার জন্যে হযরত আলী (রা.) এবং হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) পরস্পরের প্রতি বার বার অনুশোচনা প্রকাশ এবং অশ্রুপাত করলেও 'রাজনীতি'র কুটিলচক্রের শিকার হয়ে নিজেদের এবং উম্মাহ্র যে চরম ক্ষতি সাধিত হয়েছিল উভয়ের গগনবিদারী আর্তনাদে তা কোন বস্তুনিষ্ঠ সুফল আর আনেনি। পরবর্তীতে উম্মাহর জন্যে তা আফসোসের মহাকাব্য হিসেবে এখনো নিনাদিত হয়ে আসছে।

উষ্ট্রের যুদ্ধে রক্তাক্ত ময়দানে ইসলামের ছায়াতলে থেকে কুচক্রীরাই বিজয়ী হয়। আরবের সর্বত্র অস্থিরতার মুখে বেলায়তের সর্বোচ্চ মোকামের তাজধারী, শান্তি, ন্যায়, সুশাসন এবং সুবিচারের অবিসংবাদিত পথিকৃত হওয়া সত্ত্বেও রাজনীতির দুষ্টচক্র ভেদ করা মহৎ মনীষী হযরত আলী (রা.)'র পক্ষে সম্ভব হয়নি। সর্বত্র ষড়যন্ত্র বিস্তার লাভ করে। আমরা জানি ক্ষমতার জন্যে ষড়যন্ত্র এবং চক্রান্তই হচ্ছে রাজনীতির অনবদ্য সূত্র।

উষ্ট্রের যুদ্ধের বেদনাদায়ক পরিসমাপ্তির পর রোমান সীমান্তে অবস্থিত মদিনা সাধারণতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত সিরিয়া প্রদেশে হযরত উসমান (রা.) হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবিতে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা দেয়। তখন সিরিয়ার গভর্নর ছিলেন আমীর মুয়াবিয়া। তিনি ছিলেন উমাইয়া বংশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। রাজনীতি এবং প্রশাসনে খুবই অভিজ্ঞ। স্বভাবজাত শান্ত প্রকৃতির আমীর মুয়াবিয়ার নিকট অতীতের অনেক রাজা-বাদশাহদের রাজ্য পরিচালনা নীতি সম্পর্কে শুধু অধ্যয়নই ছিল না; সবকিছু ছিল অনেকাংশে তটস্থ। হযরত উসমান (রা.) উমাইয়া গোত্রের প্রভাবশালী এবং উক্ত গোত্র থেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী প্রথম মহান ব্যক্তিত্ব। এ কারণে তাঁর নির্মম হত্যাকাণ্ড শুধু উম্মাহ্কে নয় বরং কোরাইশ বংশের অত্যন্ত প্রভাবশালী গোত্র 'বনি উমাইয়া'কেও ব্যাপকভাবে নাড়া দেয়। আরবের বেদুইন সংস্কৃতির প্রকৃতিগত অভ্যাস হচ্ছে গোত্রপ্রীতি। এ ধরনের সমাজ সংস্কৃতি কখনো সর্ববিষয়ে ন্যায়বোধ লালন করেনা। বরং ব্যাপকভাবে আবেগ এবং রক্তজাত সম্পর্ককে প্রাধান্যে রাখে। ধর্ম হিসেবে ইসলাম এ ধরনের পক্ষপাতদুষ্ট সংস্কৃতি লালনের তীব্র বিরোধী। বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ (দ.) এরূপ সাংস্কৃতিক বন্ধ্যাত্ব

থেকে ইসলামের অনুসারীদের মুক্তির লক্ষ্যে সততা-নীতি-নৈতিকতার প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন করলেও সময় স্বল্পতায় তা সর্বত্র সমভাবে প্রসার পায়নি। কারণ আনুষ্ঠানিক বা প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়াদি যতো সহজে অনুসরণ ও অনুশীলন করা যায়, লোকচক্ষুর অগোচরে অন্তরের অন্তস্থলে লুকোচুরিরত হিংসা, বিদ্বেষ, ঈর্ষা, ক্ষোভ, ক্রোধ, লোভ, লালসা দূর করা অতীব কঠিন। অথচ এ ধরনের হীন মানসিক প্রবণতা বিদ্যমান রেখে আনুষ্ঠানিক ধর্মাচারী হয়ে ইসলামভুক্ত হওয়া গেলেও 'ঈমান' অর্জন করা সম্ভব হয় না। খোলাফায়ে রাশেদীনের শেষ পর্যায়ে উম্মাহ্ এ ধরনের কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হয়। হযরত উসমান (রা.)'র হত্যাকাণ্ড খেলাফত প্রশ্নে ক্ষমতামুখি এ ধরনের দুষ্ট তাড়না সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করে। সর্বত্র ধর্মীয় নৈতিকতার চেয়ে রাজনীতির অনৈতিকতা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রাধান্যে চলে আসে। হযরত উসমান (রা.) হত্যার শান্তিপূর্ণ বিচারিক সমাধানের প্রশ্নে কৃত্রিম আবেগ ছড়ানো সিরিয়া গভর্নর আমীর মুয়াবিয়ার নিকট খলিফা প্রেরিত পত্রে জবাব না দিয়ে 'খালি খাম' প্রেরণ এবং সিফ্‌ফিনের যুদ্ধে বর্শা ফলকে মীমাংসার প্রতীক হিসেবে পবিত্র কোরআন উত্তোলন সবকিছুই জটিল রাজনৈতিক গ্রন্থিরই কদর্য পদক্ষেপ। 'বর্শা ফলকে কোরআন উত্তোলন' করে মীমাংসা প্রত্যাশীদের মনোজগত ক্রুটিমুক্ত ছিল বলে ইতিহাসের ঘটনাপঞ্জিতে প্রমাণ পাওয়া যায় না। 'দুমাতুল জন্দলে'র শালিসী বৈঠকে প্রকাশিত তথ্য এবং নেপথ্য ঘটনাবলিতে নৈতিক শুদ্ধতার চরম ঘাটতি সাহাবায়ে কেরামের বৈঠকে প্রকাশ পেয়ে যায়। এই ঘটনায় বিশুদ্ধ চিত্তের সাহাবায়ে কেরাম স্তম্ভিত হয়ে যান। রাজনীতি তথা সিয়াসতের প্রতি পুণ্যবান সাহাবীদের হৃদয়গত তারতম্য ব্যাপক আকার ধারণ করে। এদিকে সিফ্‌ফিনের রণময়দানে বর্শাফলকে কোরআন উত্তোলনকে খলিফা হযরত আলী রাজনৈতিক কপটতা এবং ধর্ম নিয়ে কদাচার হিসেবে চিহ্নিত করে বিজয় না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবার আহ্বান জানিয়েছিলেন। এ ধরনের বস্তুনিষ্ঠ প্রশ্নে হযরত আলী (রা.)'র সমর্থকরা দুভাবে বিভক্ত হয়ে পড়েন। রাজনৈতিক কারণে সৃষ্টি হয় দু'টি দলের। ১. হযরত আলী (রা.)'র প্রতি অনুগতরা পরিচিতি পান শিয়া তথা সাপোর্টার অব আলী নামে। ২. ভিন্নপন্থীরা খারেজী তথা দলত্যাগী হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠে। হযরত আলী (রা.)'র সমর্থক গোষ্ঠীর অভ্যন্তরীণ বিভাজন অত্যন্ত বেদনাঘন অবস্থার সৃষ্টি করে। এক পর্যায়ে খারেজী দুর্বৃত্ত-আততায়ীর তলোয়ারের আঘাতে শাহাদাত বরণ করেন বেলায়তের সর্দার, পাক পঞ্জতন এবং আহলে বাইতে রাসুল (দ.) খলিফা হযরত আলী (রা.)। অন্যদিকে মদিনা সাধারণতন্ত্রের চরম বিশৃঙ্খলা এবং একশ্রেণির সমাজ নেতার দাম্ভিকতা ও সুবিধাবাদীতার সুযোগে খিলাফতের বুনিয়াদ দ্রুত রোমান রাজতন্ত্রের আকৃতি নিয়ে 'মুল্‌কিয়াত' তথা পারিবারিক উত্তরাধিকারীত্বের ধারায় রূপান্তরিত হয়ে দীর্ঘস্থায়ী বংশীয় রাজতন্ত্রে পরিণতি পায়। মদিনা সনদের ভিত্তিতে গড়ে উঠা গণঅধিকার ভিত্তিক সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো অতি দ্রুত রাজতান্ত্রিক স্বৈর প্রবণতার মুখে বিলুপ্ত হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে বংশ গোত্র ভিত্তিক রাজতন্ত্র নিজেদের কর্তৃত্ব টিকিয়ে রাখার পন্থা হিসেবে কিছু কিছু ফকিহ্ অভিমতের ভিত্তিতে নিজেদের সমর্থনপুষ্ট গোষ্ঠীর সৃষ্টি করে। ইসলাম ধর্মের ব্যানারে ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতির সূচনা এভাবেই ঘটে। এখানে ইসলাম ধর্ম প্রচার, ঈমানের প্রশিক্ষণ এবং বিশুদ্ধ মানব সৃষ্টির নৈতিক ধারা অবগুণ্ঠিত হয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে ইসলাম 'রাজনৈতিক ধর্ম' এবং ক্ষমতার রাজনীতির ব্যানার হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। রাজনৈতিক কারণে ব্যাপকভাবে প্রসার ঘটে ফেরকা–ফিত্‌নার। ফিত্‌না ছড়িয়ে পড়ে শিশির বিন্দুর মতো মুসলিম উম্মাহ্‌র সর্বত্র। বিভেদের শংকায় সুউচ্চ নৈতিকধারা অনুশীলনে তৎপর মোমিন বান্দারা দ্রুত জনকল-কল্লোল থেকে নিজেদের সরিয়ে নিতে থাকেন।

খোলাফায়ে রাশেদীনের পর আল কোরআনের ভাবাদর্শে গড়ে তোলা রাষ্ট্র ও সমাজকাঠামো অবগুণ্ঠিত হয়ে যায়। রাজনৈতিক ব্যবস্থায় উমাইয়া বংশীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পরবর্তী সময়ে আব্বাসীয়, হাশেমী, ফাতেমী এ ধরনের বিভিন্ন বংশ-গোত্রীয় নামে ইসলামের শিরোনাম ব্যবহার করে রাজসিক মেজাজে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ভূখণ্ড জয় এবং দেশ শাসন চালাতে থাকে। এক পর্যায়ে মুসলমানদের ধর্মীয় জাগরণের বিষয়টি জাতিগত উত্থানে রূপ নেয়। ভাষা, সংস্কৃতির বৈচিত্র্যে গড়ে উঠা জাতিগুলোর প্রাধান্যে রাজনৈতিক ব্যবস্থায়ও রূপান্তর ঘটায়। ইতোপূর্বে মুসলমানরা শিয়া-সুন্নী, খারেজী প্রভৃতি মতভেদে বিভক্ত হয়ে ধর্ম বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও বিভাজনের সংকীর্ণগলিতে ঢুকে পড়ে। জাতি এবং সংকীর্ণ অন্তর্ধর্ম সম্প্রদায়গত রাজনৈতিক ব্যবস্থার উত্থানের কারণে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ রক্ষার স্বার্থে তখন কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োগের লক্ষ্যে গোত্র, সম্প্রদায় এবং বংশীয় ধারাকে বিবেচনার ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। এর ফলে মেধা, সততা, ইনসাফ প্রভৃতি ইসলামের মৌলিক বিষয়ের গুরুত্ব হ্রাস পায়। অর্থাৎ খোলাফায়ে রাশেদীনের পর বিভিন্ন ফিত্‌নার বাড়াবাড়ি এবং কোন্দলের বিবাদী ধারা মুসলিম উম্মাহ্‌কে ক্ষমতা দখলের ক্ষেত্রে রক্তাক্ত ফয়সালায় নিমজ্জিত করে। তুর্কীদের ওসমানিয়া শাসন, ভারতবর্ষে খিলজী, ঘোরী, মোঘল শাসন মূলতঃ নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর গোত্রগত রাজনৈতিক উত্থানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ইসলাম ধর্মের মৌলিকত্ব, সাম্য, সুবিচার এবং ঐক্য সংহতির সঙ্গে এ ধরনের রাজনীতির সম্পর্ক নেই। এ কারণে ইসলাম প্রচারের অত্যন্ত শক্তিশালী নিবেদিত প্রাণ গোষ্ঠী সুফি সম্প্রদায় সিয়াসত তথা রাজনৈতিক কার্যকলাপকে উপেক্ষা করে খানকাহ্ ভিত্তিক ধর্ম প্রচার কেন্দ্র গড়ে তোলেন।

বিশ্ব রাজনীতি এবং সময়ের কাল প্রবাহে বিভিন্ন বংশ, গোত্রের নামে মুসলিম নৃপতি শাসনের ক্ষয় সাধিত হতে শুরু হলে ক্রমান্বয়ে ইউরোপ কেন্দ্রিক খ্রিস্টীয় বাণিজ্যিক-রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদী শাসনের সূত্রপাত ঘটে। ধীরে ধীরে পৃথিবীব্যাপি পর্তুগীজ, ইংরেজ, ফরাসী, স্পেনিশদের মাধ্যমে খ্রিস্টীয় চেতনার রাজনৈতিক ধারার উদ্ভব ঘটে। এদিকে ইংল্যান্ডের সোনালী বিপ্লব, ফরাসী বিপ্লব, জার্মানীতে প্রোটেস্ট্যান্টদের অভ্যুদয়ের কারণে

পৃথিবীব্যাপি সনাতনী রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। রাজতন্ত্র, পোপতন্ত্র এবং সনাতনী রাজনৈতিক ব্যবস্থার দ্রুত রূপান্তর ঘটে জনগণের অংশগ্রহণ ভিত্তিক 'জনসম্মতি তত্ত্বের' আলোকে। শুরু হয় আধুনিক গণতন্ত্রের অভিযাত্রা। ইউরোপের এই রাজনৈতিক–সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী উত্থানের মুখে পতন ঘটতে থাকে মুসলিম সাম্রাজ্যসমূহের। এদিকে ইউরোপ জুড়ে রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে যুক্ত হয় আধুনিক দল ব্যবস্থা। রাজনীতির সংজ্ঞা ক্ষমতাকেন্দ্রিক উন্মুক্ত মূল্যবোধে (VALUE FREE) রূপ নেয়। পূর্বে যেখানে ক্ষমতা দখলের জন্যে প্রয়োজন হতো বর্বর বলপ্রয়োগ পন্থা, বর্তমানে তা নিরাময়ের জন্যে আবির্ভাব ঘটে আধুনিক রাজনৈতিক দল ব্যবস্থার। সশস্ত্র যুদ্ধের পরিবর্তে কৌশল, কুটকৌশল, চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র, স্বার্থান্ধতা, অনৈতিকতা প্রভৃতি রাজনৈতিক সূত্রের অত্যাবশ্যকীয় শর্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। রাজনৈতিক দল ধর্ম, অধর্ম, ধর্ম নিরপেক্ষ– যে নামেই হোক না কেন এর সঙ্গে নৈতিকতার অবস্থান অনেকাংশে শূন্য হয়ে যায়। ধর্ম প্রচারের সঙ্গেও বাগাড়ম্বর ব্যতীত রাজনৈতিক দলের সংযোগ থাকে না। ফলে রাজনৈতিক দল ধর্মকেন্দ্রিক বা অন্য যে কোন মতাদর্শের আলোকে গড়ে উঠুক না কেন সবকিছুর মূল বিষয় রাজনৈতিক ক্ষমতা, প্রশাসন এবং আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাপনায় দলকেন্দ্রিকতা। এ ধরনের রাজনীতির সঙ্গে ঐতিহ্যগতভাবে ইসলাম ধর্মের সম্পর্ক নেই বললে চলে। এ কারণে দেখা যায় পৃথিবীর দেশে দেশে মাযহাব এবং ফিত্না অনুযায়ী ইসলামের শিরোনামে রয়েছে অসংখ্য দল। এ ধরনের ব্যবস্থা ঐক্য ও সংহতির নয়, বরং বিভাজনকেই প্রতিষ্ঠা করে চলেছে। অথচ ইসলামের মূল দাওয়াত হচ্ছে ইনসানিয়াত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আদমজাতির ঐক্যের।

ইসলাম ধর্মের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, রণনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রতিটি ক্ষেত্রে সততা এবং নৈতিকতার গুরুত্ব অনুধাবনের জন্যে খোলাফায়ে রাশেদীন সমকালীন একটি ঘটনা উল্লেখের দাবি রাখে। ঘটনাটি হযরত আলী (রা.)'র খিলাফত পরিচালনাকালীন সময়ের। সিফ্ফিন যুদ্ধে আমীর মুয়াবিয়ার সৈন্যদল যখন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছিল, বিজয় যখন খলিফা হযরত আলী (রা.)'র দ্বারপ্রান্তে তখন সিরিয়ার আমীরের সঙ্গে পরামর্শ করে মিশর বিজয়ী সাহাবা হযরত আমর ইবনে আস ছাহমী কোরাইশী বর্শা ফলকে বেঁধে মহাগ্রন্থ পবিত্র কোরআন উত্তোলন করতে সৈনিকদেরকে আদেশ দেন। বর্শা ফলকে কোরআন দেখে আল কোরআনের সম্মানার্থে হযরত আলী (রা.)'র সৈন্য হঠাৎ থেমে পড়েন। হযরত আমর তখন সকলকে বুঝান যে, 'মুসলমানদের হাতে মুসলমানদের রক্তপাত উচিত নহে। কোরআনের হুকুমানুযায়ী মীমাংসা করতে আমীর মুয়াবিয়া সম্মত আছেন।' যদিও হযরত আলী (রা.) জানতেন, কোরআন উত্তোলন বিষয়টি ছিল নিশ্চিত পরাজয়ের হাত থেকে আত্ম রক্ষার একটি অপকৌশল তবুও আল কোরআনের প্রতি সাধারণ সৈনিকদের আবেগ প্রবণ ভালোবাসা এবং আনুগত্যের কারণে হযরত আলী (রা.) যুদ্ধবিরতি এবং বিরোধের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তিতে সম্মতি দেন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দুমাতুল জন্দলে আমীর মুয়াবিয়ার পক্ষের সালিস হযরত আমর এবং খলিফা হযরত আলী (রা.)'র পক্ষে সালিস রাজনৈতিক কুটকৌশলে অনীহা, সুফি স্বভাবের সত্যনিষ্ঠ সাহাবী হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.) আপোষের জন্যে সমবেত হন। উভয়ের মধ্যে সত্য মীমাংসা হিসেবে কথা ছিল হযরত আলী (রা.) এবং আমীর মুয়াবিয়া উভয় প্রতিদ্বন্দ্বী খলিফাকে পদচ্যুত করে নতুন এক খলিফা নির্বাচিত করা হবে। পূর্ব সিদ্ধান্ত মোতাবেক হযরত আবু মুসা (রা.) মিম্বরে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন, 'আমি আলীকে পদচ্যুত করলাম'। এরপর আমর মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেন, 'আপনারা জানেন, মুয়াবিয়া এবং আলীর মধ্যে খিলাফত নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীতা ছিল যার ফলে পনের হাজার মুসলমানের অকারণ জীবন নষ্ট হয়েছে। এখন আলীর প্রতিনিধি আবু মুসা আলীকে পদচ্যুত বলে আপনাদের সম্মুখে ঘোষণা করেছেন। অতএব, আমি ঘোষণা করছি যে, মুয়াবিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী আলী (রা.) অপসারিত হওয়ায় মুয়াবিয়াই সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি, তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী খলিফা আমীরুল মু'মিনীন'। এই ঘোষণা শুনে তওবা তওবা বলতে বলতে আবু মুসা উধাও হন। জীবনে তিনি আর জনসমাজে বের হননি। হিজরী ৪৩ সনে নব্বই বৎসর বয়সে আমর ইবনে আস মিশরে ইন্তিকাল করেন। এরপর তাঁর পুত্র মিশরের গভর্নর নিযুক্ত হন। আমর ইন্তিকালের পূর্বে আক্ষেপ করে বলেছিলেন, আমার জীবনে এমন এক কাল ছিল, যখন মৃত্যুবরণ করলে নিশ্চয়ই জাহান্নাম আমার স্থান হতো। (বিষয়টি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে)। এরপর এমন এক সময় পেয়েছিলাম, যখন মৃত্যুবরণ করলে বেহেশ্তের জন্যে নিশ্চিত হতে পারতাম। কিন্তু শেষ পর্যায়ে এমন এক কালের সম্মুখীন হয়েছি যে, আল্লাহ্ আমাকে কোথায় স্থান দেবেন তা বলতে পারছি না– তারীখে খোলাফা। (সূত্রঃ আল-ফারুক : মূল–আল্লামা শিবলী নোমানী, অনুবাদক মাওলানা মুহীউদ্দীন খান, এম. এম. এমদায়িয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা। চতুর্থ অধ্যায়ঃ ব্যাপক বিজয় অভিযান, পৃষ্ঠা- ১৯ টীকা অংশ)। ইন্তিকালের পূর্বে হযরত আমর ইবনে আস (রা.)'র আফসোস থেকে ইসলাম ধর্ম এবং রাজনীতির সম্পর্কটি বিষয়ের নৈতিক অবস্থান যথাসম্ভব স্পষ্ট হয়েছে। সুতরাং রাজনীতির আচরিক ধারা কখনো ধর্ম হিসেবে ইসলামের নীতি শাস্ত্র এবং মৌলিকত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। রাজনীতি ও ইসলামের চরম সাংঘর্ষিক সম্পর্কের বিষয়টি অনুধাবনের জন্যে মোঘল সাম্রাজ্যের সময়ে ভারতের ইতিহাস এবং মোঘলদের পতনের মুখে বহিরাগত ফারসি-আফগানি আক্রমণকারী আবদালী- দূররানীদের ভূমিকা পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট হয়ে যায়, রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং ইসলাম নৈতিক অর্থে অভিন্ন নয়।

যে তিনটি কাজ না করার কারণে আফসোস সেগুলো হচ্ছে; ১. আশ্আস্ ইবনে কায়সকে বন্দি করে যখন আমার সম্মুখে উপস্থিত করা হয়েছিল তখন তাকে নিহত করে ফেলাই আমার উচিত ছিল। আমার বিশ্বাস, সে এখন কোথাও বিবাদ বাধাবার চেষ্টায় রয়েছে।

সে একজন বিবাদ প্রিয় লোক। ২. খালেদ বিন ওয়ালিদকে মুরতাদ্দের শায়েস্তা করার জন্যে প্রেরণ করে যুলকেচ্ছায় অবস্থান করা আমার উচিৎ ছিল। তাহলে সেখান হতে আমি তাঁর সাহায্যার্থে তাড়াতাড়ি যেতে পারতাম। ৩. খালেদ ইবনে ওয়ালিদকে সিরিয়া প্রেরণ করে আমার উচিত ছিল, উমরকে ইরাকে প্রেরণ করা। তাহলে আমার দু'হাত আল্লাহ্র রাস্তায় প্রসারিত হয়ে যেত।

তিনটি বিষয় রাসুলুল্লাহ্ (দ.)'র নিকট জিজ্ঞেস না করায় তাঁর আফসোস ছিল। এগুলো হলো– ১. নবি করিম (দ.)'র নিকট জিজ্ঞাসা করে রাখা উচিত ছিল, তাঁর পরে খলিফা কে হবেন? তা হলে কোনো গোলযোগই উপস্থিত হতো না। ২. এ কথাও জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল, খেলাফতে আনসারদেরও কোন দাবি আছে কি না? ৩. ভ্রাতুষ্পুত্রী ও চাচির মিরাস বণ্টনের মাসআলা জিজ্ঞাসা করাও প্রয়োজন ছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে রাষ্ট্র পরিচালনা বিষয়ে এ ধরনের আত্মজিজ্ঞাসা প্রবণ ব্যক্তিত্বের দৃষ্টান্ত সত্যিই বিরল। (সূত্রঃ সিদ্দিকে আকবর হযরত আবু বকর (রা.)–মাওলানা আবদুল হালিম, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, পৃষ্ঠাঃ ২৩৭-২৩৮)।

ঠাণ্ডাজনিত জ্বরে আক্রান্ত হয়ে হযরত আবু বকর (রা.) পনেরো দিন অসুস্থ ছিলেন। অসুস্থ অবস্থায়ও তিনি খিলাফতের দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত ছিলেন। একদিকে পরপারে মহান আল্লাহ্র সঙ্গে মিলনের ইচ্ছা, অন্যদিকে স্থিতিস্থাপকভাবে সংরক্ষিত খিলাফতের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব নির্ধারণের তাড়না তাঁকে ব্যস্ত করে তোলে। অসুস্থ অবস্থায় তাঁর নির্দেশে হযরত উমর (রা.) মসজিদে নববীতে জামাতের নামাযে ইমামতি করেন। ভবিষ্যৎ খলিফা নির্বাচন বিষয়ে তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। এ ব্যাপারে তিনি হযরত উমর ফারুক (রা.) সম্পর্কে বিভিন্ন সাহাবার মতামত গ্রহণের পাশাপাশি আল্লাহ্র দরবারে ফয়সালার জন্যে করুণ ফরিয়াদ রেখে এস্তেখারা করতে থাকেন। এ ব্যাপারে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)'র বর্ণনায় দেখা যায়, "আমি খেলাফত কার হাতে ন্যস্ত করব, এ বিষয়ে আজ রাতে উপর্যুপরি এস্তেখারা করেছি এবং আল্লাহ্ তাআলার কাছে আকুতি জানিয়েছি যে আমাকে খেলাফত এমন ব্যক্তির হাতে সোপর্দ করার তাওফিক দান করা হোক, যাঁর প্রতি তিনি সন্তুষ্ট। এরপর তিনি বলেন, তোমরা জান আমি মিথ্যার আশ্রয় নেব না এবং কোন বুদ্ধিমান নেই, যে আল্লাহ্র সান্নিধ্যে যাওয়ার সময় আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যাচারের আশ্রয় গ্রহণ করবে। উপস্থিত সকলে বলে উঠেন: হে খলিফায়ে রসুল, আপনার সত্যবাদিতায় কে সন্দেহ করবে? আপনি যা বলতে চান, বলুন।

হযরত আবু বকর (রা.) বলেন: রাতের শেষ ভাগে আমি গভীরভাবে নিদ্রাতুর হয়ে পড়লাম এবং রাসুলুল্লাহ্র (দ.)'র নূরানী দিদারে ধন্য হলাম। তিনি দুটি সাদা পোশাক পরিহিত ছিলেন। আমি উভয় কাপড়ের উভয় প্রান্ত মিলাচ্ছিলাম। হঠাৎ উভয় কাপড় সবুজ হতে এবং ঝলমল করতে শুরু করল। পোশাকের ঔজ্জ্বল্য ও দ্যুতিতে দর্শকের চক্ষু ঝলসে যাচ্ছিল। হুজুর (দ.)'র ডানে বামে দু'জন নেহায়েত সুশ্রী যুবক দণ্ডায়মান ছিলেন। যাদেরকে দেখে মন ও প্রাণ আনন্দে আপ্লুত হচ্ছিল। হুজুর (দ.) আমাকে আস্সালামু আলাইকুম বলে মোসাফাহা দ্বারা ধন্য করলেন। অতঃপর স্বীয় পবিত্র হাত আমার বক্ষে রেখে দিলেন। ফলে, আমার অস্থিরতা ও হৃদকম্পন দূর হয়ে গেল।

এরপর তিনি বললেন: হে আবু বকর, আমি তোমার সাথে মিলিত হওয়ার জন্যে খুবই আগ্রহী। আমার কাছে এসে যাওয়ার সময় কি এখনও হয়নি? হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, একথা শুনে আমি স্বপ্নের মধ্যে খুব ক্রন্দন করলাম। এমনকি, আমার গৃহের লোকজনও আমার কান্না টের পেয়ে গেল। পরে তারা আমাকে এই ক্রন্দনের কথা অবহিত করেছিল।

এরপর আমি বললাম: ইয়া রাসুলাল্লাহ্ (দ.), এরা উভয়েই আপনার নিকটবর্তী হয়েছে? তিনি বললেন, নৈকট্য এখনও কিছু বাকি আছে। কেননা, তুমি বিনে মিলন ও বিরহ অর্থহীন।

এবার রাসুলে করিম (দ.) আমাকে বললেন, খেলাফত কাকে ন্যস্ত করবে– এ বিষয়ে আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমতা দিয়েছেন। আমি আরয করলাম: হুজুর, আপনিই কাউকে পছন্দ করে দিন। তিনি বললেন, আল্লাহ্ উমর ফারুককে শাসকরূপে পছন্দ করেছেন। তিনি সত্যবাদী ও শক্তিশালী এবং সর্বকালে সর্বত্র পবিত্রতম ব্যক্তি। এরপর হুজুর (দ.) বললেন, এই ব্যক্তিদ্বয় ওফাতের সময় তোমার উযীর হবে এবং বেহেশ্তে তোমার পড়শী হবে।

অতঃপর হুজুর (দ.) আমাকে আস্সালামু আলাইকুম বললেন। যুবকদ্বয়ও তাই করলেন। তাঁরা আরও বললেন, আপনি অপ্রিয় বিষয় থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে গেছেন। আপনি আকাশেও সিদ্দিক, মানুষের মধ্যেও সিদ্দিক এবং ফেরেশ্তাদের মধ্যেও সিদ্দিক। আমি আরয করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ্, এ যুবকদ্বয়ের পরিচয় কী? হুজুর (দ.) বললেন, এরা উভয়েই সম্মানিত ও গণ্যমান্য ফেরেশ্তা, যাঁদের নাম জিবরাঈল ও মিকাঈল (আ.)– এ পর্যন্ত বলে রাসুলুল্লাহ্ (দ.) চলে গেলেন এবং আমি জাগ্রত হয়ে গেলাম। আমার গাল বেয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল এবং আমার পরিবার পরিজন আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে ক্রন্দন করছিল। (শাওয়াহেদুন নবুয়ত: মূল: আল্লামা আবদুর রহমান জামি (রহ.), অনুবাদ: মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, মদীনা পাবলিকেশন, পৃষ্ঠা: ২০০-২০১।

উদার পন্থার নৈতিক সমাজ বিনির্মাণে উলামায়ে কেরামের ভূমিকা

♦ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল কাদের ছাকিব আল কাদেরী ♦

১. উদার পন্থার নৈতিক সমাজ বলতে এমন একটি আদর্শ ব্যবস্থাকে নির্দেশ করে যেখানে ব্যক্তি স্বাধীনতা, প্রতিটি মানুষের অধিকার এবং আপেক্ষিক সমতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করা হয়। এক্ষেত্রে মত প্রকাশের লক্ষ্যে সমাজে বসবাসরত সকল শ্রেণি পেশার মানুষের সমঅধিকার নিশ্চিত থাকা বাঞ্ছনীয়। যাতে প্রতিটি প্রাণ সমভাবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়। বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য এবং সহনশীলতার অধিকার অক্ষত থাকে। অপরদিকে উদারতার মোড়কে অবাধ, অশ্লীল এবং অনৈতিক জীবনযাপন অতিবাহিত যাতে করতে না পারে তার ব্যবস্থা থাকা দরকার। ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং অধিকারের দোহাই দিয়ে ধর্মীয় মূল্যবোধ ভিত্তিক অনুশাসনকে বৃদ্ধাঙুলি দেখানোর প্রবণতাকে রদ করা নৈতিক সমাজের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। আসলে এ বিষয়ে কথা বলা যতো সহজ বাস্তবায়ন করা তার চেয়ে অনেক জটিল ও কঠিন। রীতিমতো চ্যালেঞ্জ। এই দুঃসাধ্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে অগ্রণী ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব আছে। চিরন্তন সত্য হলো– একজন উদার মনোভাবের বিশুদ্ধ আক্বিদা সম্পন্ন ব্যক্তির মাধ্যমেই সম্ভব উদার ও নৈতিক সমাজ বিনির্মাণ। নীতিহীন ব্যক্তিদের কাছে সুন্দর ও সহ অবস্থানের সমাজ আশা করা অরণ্যে রোদনের মতো। বলা যায় স্বর্ণলতিকায় কাঁঠাল ফল খোঁজার শামিল। আজ থেকে দেড় হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ্ তা'য়ালার প্রিয়তম হাবিব (দ.) উম্মতকে নীতি-নৈতিকতা বর্জিত উলামায়ে কেরামের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। কারণ নবিজি (দ.) জানতেন– একটা সময় এই মানুষগুলো সমাজ ব্যবস্থার জন্য ক্ষতির কারণ হবে। হুজুর (দ.) উল্লেখ করেছেন– অর্থ: 'আমি আমার উম্মতের জন্য পথভ্রষ্ট ইমামের (আলিমের) অনিষ্টতার ব্যাপারে ভীত-সন্ত্রস্ত'– (সুনান-ই-তিরমিযি, খ.-৪, পৃ.-৮৪, হাদিস নং : ২২২৯)।

২. একটি উদার ও নৈতিক সমাজ গঠনে উলামায়ে কেরামের ভূমিকা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত সহজাত ধারণা প্রকাশ করা প্রয়োজন।

ক. উদার ভিত্তিক মানবিক সমাজ গঠনে ইসলামের নির্দেশনা: মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা প্রসারিত অন্তরের মানুষকে খুব পছন্দ করেন। যুগে যুগে নবি-রাসুল (আ.)গণ, সাহাবায়ে কেরাম এবং পরবর্তী সময়ে আউলিয়ায়ে কেরাম উদারতার ভিত্তিতে সমাজ গঠনে প্রাসঙ্গিক ভূমিকা রেখেছেন। ধৈর্য, সহ্য এবং পারস্পরিক যোগাযোগের ভিত্তিতে একটি সুন্দর সহাবস্থানের কমিউনিটি রূপায়ন করেছেন। এ বিষয়ে পবিত্র কোরআনের দিক-নির্দেশনা হচ্ছে– অর্থ: 'হে মুমিনগণ! ধৈর্য অবলম্বন করো, দৃঢ়তা প্রদর্শন করো, নিজেদের প্রতিরক্ষাকালে পারস্পরিক বন্ধন মজবুত করো এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করো যেনো সফলকাম হতে পারো'– (সূরা আলে ইমরান : ২০০)। অতএব, উদারতা এবং সৌহার্দের ভিত্তিতে সমাজ গঠন করাই ইসলামের অন্যতম লক্ষ্য।

খ. উলামায়ে কেরামের প্রাসঙ্গিক ভূমিকা: নীতি এবং উদারতার আবহে সমাজকে সাজাতে উলামায়ে কেরাম যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করতে পারেন। আমাদের সোনালী অতীত পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে; আহলুল বাইত, সাহাবায়ে কেরাম, উপমহাদেশের আধ্যাত্মিক জগতের অধিপতি, সুলতানুল হিন্দ খাজা গরীব নেওয়াজ, আমাদের এই লাল সবুজ ভূমির জন্য আল্লাহ্‌র মহান অনুগ্রহ হুজুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) এবং হযরত শাহানশাহে সিরিকোট সৈয়দ আহমদ সিরিকোটি (রহ.) সহ অসংখ্য অলিউল্লাহ্ সবাই আপন যুগে একটি শুদ্ধাচার যুক্ত সমাজ গঠনে সর্বোচ্চ খেদমত করেছেন। এর ফলে মানব জাতি নির্বিরোধ অবস্থান গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অনেকাংশেই সফল হয়েছেন। তাঁদের জীবন বিশ্লেষণ করে কিছু টার্নিং পয়েন্ট বা কর্মসূচি তুলে ধরা আবশ্যক।

আলেম সমাজকে হতে হবে উদার: আলেম সমাজ হবেন উদারতার প্রতীক। সব ধরনের কুণ্ঠা এবং সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত। সমাজের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের মতামত কে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবেন। তাঁদের মন হবে আকাশের চেয়েও বিশাল। হৃদয়জুড়ে থাকবে সিন্ধুসম মমতার জোয়ার। আল্লাহ্ তা'য়ালার সকল মাখলুকের জন্য সমান দয়া-মমত্ববোধ এবং ভালোবাসা– আলেম-উলামারা হবেন তাঁরই প্রতিনিধি। যেনো নববী চরিত্রেরই প্রতিবিম্ব। হাদিসে পাকে ইরশাদ হয়েছে– আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন– 'হে মুহাম্মদ (দ.)! আপনি আমার বান্দা এবং রাসুল। আমি আপনাকে ভরসাকারী হিসেবে অবহিত করেছি। আপনি রুক্ষভাষী এবং কঠিন হৃদয়ের অধিকারী নন। না আপনি অনর্থক ঘোরাফেরা করেন। আপনি কখনও আঘাতের প্রত্যুত্তরে আঘাত করেন না। অধিকন্তু আপনি ক্ষমা ও দয়া প্রদর্শন করেন'– (ইমাম বুখারী, আস সহিহ, খ.-০৩, পৃ.-৬৬, হাদিস নং : ২১২৫)।

জ্ঞান পিপাসু: গ্রীষ্মের তপ্ত রোদে, ভরদুপুরে মরুর পথে চলতে থাকা মানুষ যেমনিভাবে তৃষ্ণার্ত হয়; তার চাইতে হাজারো গুণ বেশি জ্ঞান পিপাসায় পিপাসার্ত হবেন একজন আলেম। একটি

বিষয় অবশ্যই মনে রাখতে হবে বিভাজন বা 'ইফতিরাক'-এর জ্ঞান নয়। বরং প্রয়োজন ভালোবাসা, সৌহার্দ্য, ইনসাফ এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নের জ্ঞান অর্জন। নিঃসন্দেহে এ কথা সর্বজনস্বীকৃত; আলেম সমাজ ন্যায় এবং কল্যাণের মশাল, সামাজিক কুসংস্কার রোধে আলোকবর্তিকা। প্রিয় নবি (দ.) ইরশাদ করেন– 'উলামায়ে কেরাম আকাশের তারকা সদৃশ'– (মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং : ১২৬০০, রাবী- হযরত আনাস রাদ্বি.)। তাঁরা তাঁদের জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করবেন সমাজ।

নৈতিকতার বাতিঘর: সমাজ থেকে নাস্তিকতা, শিরক, কুফর, খোদাদ্রোহ এবং নবিদ্রোহ বিদূরণের মাধ্যমে সমাজে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা অব্যাহত রাখা আলেমদের কাজ। যাবতীয় অশ্লীলতা, অনৈতিকতা প্রতিরোধে আলেম সমাজের ভূমিকা অপরিহার্য। উলামায়ে কেরাম তাঁদের আখলাকের ছোঁয়ায় একটি নৈতিক ও নিরাপদ সমাজ গঠন করতে সচেষ্ট থাকবেন। আমরা জানি, আউলিয়ায়ে কেরাম তাঁদের নৈতিক চরিত্রের প্রভাবে সমাজে জাগরণ সৃষ্টি করে থাকেন। তাঁদের চরিত্র ছিলো নববী ধারা প্রভাবিত চরিত্র। যেমনটি নবি (দ.) সম্পর্কে কোরআন সাক্ষ্য দিচ্ছে– 'নিশ্চয়ই আপনি সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী'– (সূরা ক্বলম : ৪)

শালীন দা'ওয়াহ: প্রাঞ্জল, শালীন, রুচিশীল ভাষায় সমাজের মানুষকে কাউন্সিলিং করা আবশ্যক। কোনো অবস্থাতেই অশালীন কুরুচিপূর্ণ এবং রুচি বিবর্জিত ভাষায় খোটা মারা বা বডি ল্যাংগুয়েজ ব্যবহার করা সঙ্গত নয়। মনে রাখতে হবে কোন রুচি বিকারগ্রস্ত এবং অশালীন ব্যক্তির মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তন সূচিত হতে পারে না। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে– 'আর তাঁর চেয়ে কার কথা উত্তম যে আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে; নিশ্চয়ই আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত'– (সূরা ফুস্‌সিলাত : ৩৩)।

সমসাময়িক বিষয়ে দক্ষতা: একজন আলেমকে অবশ্যই পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে জানতে হবে। নিজের গতানুগতিক আমল বা সেকেলে নীতি বাদ দিয়ে অবশ্যই নিজেকে সময়ের ছাঁচে গড়ে তুলতে হবে। তাছাড়া পরিবর্তিত সমাজের চাহিদার আলোকে যথাসময়ে যুৎসই প্রচারণা ও পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ চালিয়ে যেতে হবে। উদাহরণ সাপেক্ষে বলা যেতে পারে; সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সুন্নী ঘরানার আলেম-উলামারা এক ধরনের অবজ্ঞার মুখোমুখি হয়েছেন। এর মূল কারণ, যথাসময়ে যথাযথ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে আমাদের উদাসীনতা।

সামাজিক উন্নতির প্রকল্প গ্রহণ: Social Developement বা সামাজিক উন্নতি বলতে আমরা বুঝি, সমাজে বসবাসরত সকল শ্রেণি পেশার মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন। যেমন–

১. **বেকারত্ব নিরসন:** এ কথাটি ধ্রুব সত্য যে 'ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়'। বেকারত্বের অভিশাপে জর্জরিত সমাজে মানুষগুলো কখনও উদার এবং নৈতিক হতে পারে না। ধর্মের কথাগুলো তাঁদের কাছে 'পূর্ণিমার চাঁদ যেনো ঝলসানো রুটি'। আলেম সমাজের নৈতিক দায়িত্ব হলো; সমাজের বিভিন্ন এলিট শ্রেণির সাথে কো-অপারেট করে তাঁদের কর্মসংস্থান করা। যার বস্তুনিষ্ঠ উদাহরণ SZHM ট্রাস্ট, যারা অকাতরে বিভিন্নভাবে অবহেলিত শ্রেণির পাশে দাঁড়াচ্ছে।

২. **অবহেলিত শ্রেণির দেখভাল:** সমাজে অবহেলিত বলতে বোঝায় এতিম, মিসকিন, হত দরিদ্র জনগোষ্ঠী। পাশাপাশি চিকিৎসা ও শিক্ষা বঞ্চিত শিশু ও নারী সমাজ। যারা সমাজের একটি বিস্তীর্ণ অংশজুড়ে বিদ্যমান। তাঁদের দেখভাল পরিচর্যা এবং উন্নতির ব্যবস্থা করা আবশ্যক। তারা যদি আমাদের অগোচরে অবহেলিত থেকে যায়, তাহলে আমরা আদর্শ সমাজ গঠনের পথে পৌঁছাতে পারবো না। মনে রাখতে হবে খ্রিস্টান মিশনারী এ কাজে অনেক পারদর্শী এবং অগ্রগামী। এ বিষয়ে সমাজের বিশাল অংশ মহিলাদের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা এবং কার্যক্রমের উদ্যোগ নেয়াও জরুরি।

মুক্ত সমালোচনা গ্রহণ: একজন আলেমকে অবশ্যই তাঁর কাজের ওপর মুক্ত সমালোচনা গ্রহণের মানসিকতা অর্জন করতে হবে। শুধুমাত্র বাহবা পাওয়ার উদ্দেশ্যে কাজ করা কোনো অবস্থাতেই আদর্শবান ব্যক্তির কাজ হতে পারে না। এটি অধিকন্তু 'রিয়া' শিরকে আসগর। মনে রাখতে হবে, আল্লাহ্ তায়ালার প্রিয়ভাজন বান্দাগণ বা আউলিয়াগণ কখনও কারো প্রশংসা পাওয়ার উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করেননি। আলেম সমাজকে অবশ্যই সমালোচনা সহ্য করার শক্তি অর্জন করতে হবে। এটিও নববী চরিত্রের অংশ। জ্ঞানপুরোধা একজন গুণীজন বলেছেন, 'আল্লাহ্‌র সৃষ্টি জগতে সবচেয়ে বেশি সমালোচনা সহ্য করবার শক্তি বা শক অবজরবিং ক্যাপাসিটি ছিলো প্রিয় নবি (দ.)'র নিকট'। আলেম সমাজকেও সেই মূলমন্ত্রে এগিয়ে আসতে হবে। তবেই গঠিত হবে উদার ও নৈতিক সমাজ।

পরিশেষে রাসুলে পাক (দ.)'র একটি হাদিসের মাধ্যমেই আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। উদারতা, ইখলাস এবং নৈতিকতাই ঈমানের মজবুত ভিত। 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র জন্য ভালোবাসে, আল্লাহ্‌র জন্য ঘৃণা করে, আল্লাহ্‌র জন্য দান করে এবং আল্লাহ্‌র জন্য বিরত থাকে (বা বঞ্চিত করে), সে ব্যক্তি ঈমানকে পূর্ণতা দান করেছে'– (সুনানু আবি দাউদ, হাদিস নং : ৪৬৮১)।

“মাযহাবে ইশ্‌ক আয্ হামে দ্বীনহা যুদাস্ত আশেকাঁরা মাযহাব ও মিল্লাতে খোদাস্ত”

আল কোরআনের আয়াত ঘনিষ্ঠ আল্লামা রুমীর কালামের ব্যাখ্যা

♦ মাওলানা মোহাম্মদ মিনহাজ উদ্দিন ♦

ফারসি সাহিত্য ভাণ্ডারের অনন্য প্রতিভা সুফি কবি, দার্শনিক আল্লামা জালাল উদ্দিন রুমী (রহ.) উপর্যুক্ত কালামের মাধ্যমে স্রষ্টা প্রেমে আত্মহারা বান্দা মাত্রই যে মাযহাবে ইশ্‌কের সদস্য তা বর্ণনা করে আল্লাহ্ প্রেমিকদের একটি অবিনশ্বর ঈমানী ঠিকানা স্পষ্ট করেছেন। ইশ্‌কই হচ্ছে বান্দার ইবাদতের ইখলাস এবং ঈমানের গতি নির্ধারক শক্তি। ঈমানের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছেন মহান স্রষ্টা আল্লাহ্। এই দিব্যশক্তি যখন বান্দার নিকট স্পষ্ট হয় তখনই বান্দা আল্লাহ্‌তে অভিন্নতায় লীন হয়ে পড়েন। স্রষ্টা বন্দনার একাগ্রতায় তখন আল্লাহ্ ব্যতীত সবকিছুই অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। তখন বিশ্বাসে অটুট হয়ে যায়, ‘মহাবিশ্বের যেখানে যা-কিছু আছে সবই নশ্বর। অবিনশ্বর শুধু আপনার প্রতিপালকের সত্তা, যিনি মহামহিম, মহানুভব” –(সূরা আর রাহমান : ২৬-২৭)। মহামহিম স্রষ্টা আল্লাহ্‌র একক অবিনাশী সত্তার মধ্যেই যাঁরা আত্মলীন হয়েছেন সৃষ্টিজগতে তাঁদের কর্ম এবং বিশ্বাস পৃথিবীর অন্যান্য পথ থেকে ভিন্ন। এ কারণে আল্লামা রুমী হযরত শামসে তাবরিজের পবিত্র পরশ পেয়ে লিখেছেন, “মাযহাবে ইশ্‌ক আয্ হামে দ্বীনহা যুদাস্ত/আশেকাঁরা মাযহাব ও মিল্লাতে খোদাস্ত– অর্থাৎ ইশ্‌কের মাযহাব সবধর্মমত থেকে আলাদা। প্রেমিকদের একমাত্র ধর্ম ও জাতি হলো আল্লাহ্ পবিত্র কোরআন এবং হাদিস শরিফে এতদ্‌বিষয়ে রয়েছে সমূহ দিকনির্দেশনা। মূলত শিরোনামের সত্য নির্যাস স্পষ্ট করার জন্য আল কোরআন এবং হাদিস শরিফের আলোকে এ নিবন্ধের অবতারণা।

ঝক্‌ঝকা-ঝক্ শব্দ তুলে ট্রেন ছুটে চলার সময় কোনো বাচ্চা যখন তা দেখে, তখন তার চেতন কিংবা অবচেতন মনে প্রশ্ন জাগে– এতো লম্বা গাড়ি, উল্টে যায় না কেন? একে মাটির সাথে দাঁড় করিয়ে রেখেছে কীসে? বয়স বৃদ্ধির এক পর্যায়ে সে দেখে ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকার এই কারিশমা; লোহার বর্ত্ম বা রেল লাইন একে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। একইভাবে ইসলামও আমাদের হৃদয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বা অবস্থান নেয় বর্ত্মের উপর ভর করে। আর সেই বর্ত্মের নাম পবিত্র কোরআন-সুন্নাহ্‌র ভাষায় ‘ইশ্‌ক-মহব্বত’। ইরশাদ হয়েছে, “আর মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে তাঁর সমকক্ষ বানায় এবং তাদেরকে আল্লাহ্‌কে ভালোবাসার মতো ভালোবাসে। কিন্তু যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহ্‌কে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে” –(সূরা বাক্বারা : ১৬৫); “হে রাসূল, তাদেরকে বলে দিন যে, যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালোবাসো তবে আমাকে অনুসরণ করো; আল্লাহ্ তোমাদের ভালোবাসবেন” –(সূরা আলে ইমরান : ৩১); “ওহে যারা ঈমান এনেছ, তোমাদের মধ্য থেকে কেউ দ্বীন থেকে ফিরে গেলে বা মুরতাদ হয়ে গেলে তদস্থলে আল্লাহ্ এমন এক সম্প্রদায় আনবেন যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারাও তাঁকে ভালোবাসবে” –(সূরা মায়েদা : ৫৪)। হাদিসে পাকে ইরশাদ হয়েছে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্‌র রাসুল (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসহাবিহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, সেই পবিত্র সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের কেউ প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা ও সন্তানের চেয়ে বেশি প্রিয় হই” –(সহিহ্ বোখারি, হাদিস নম্বর : ১৩, ঈমান অধ্যায়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত); হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্‌র রাসুল (দ.) ইরশাদ করেন, তোমাদের কেউ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষন না আমি তার কাছে তার পিতা, সন্তান ও সব মানুষের চেয়ে বেশি প্রিয় হই” –(সহিহ্ বোখারি, হাদিস নম্বর : ১৪, ঈমান অধ্যায়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত); হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে হিশাম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একদা আল্লাহ্‌র রাসুল (দ.)'র সঙ্গে ছিলাম। তিনি তখন হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা.)'র হাত ধরে ছিলেন। হযরত উমর (রা.) তাঁকে বললেন, ‘ইয়া রাসুলাল্লাহ্, আমার প্রাণ ব্যতীত আপনি আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়।’ তখন আল্লাহ্‌র রাসুল (দ.) বললেন, ‘না, ঐ মহান সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! এমনকি তোমার কাছে তোমার প্রাণের চেয়েও আমাকে অধিক প্রিয় হতে হবে।’ তখন হযরত উমর (রা.) তাঁকে বললেন, ‘আল্লাহ্‌র কসম! এখন আপনি আমার কাছে আমার প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয়।’

অতঃপর আল্লাহ্‌র রাসুল (দ.) বললেন, 'হে উমর, এখন (তোমার ঈমান পূর্ণ হয়েছে)'।" –(সহিহ্ বোখারি, হাদিস নম্বর : ৬১৭৮, শপথ ও মানত অধ্যায়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত)।

'ইশ্‌ক-মহব্বত' ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন স্তরের হয়। সবার ইশ্‌ক-মহব্বতের বহিঃপ্রকাশও একইরকম হয় না। কেউ আল্লাহ্, আল্লাহ্‌র রাসুল (দ.) কিংবা ইসলামকে মহব্বত করেন, ইসলাম গ্রহণ করেন। এখানে সাধারণ যে-কোনো মুসলিম উদাহরণ হিসেবে সাব্যস্ত হতে পারেন। তাঁর ভেতর আল্লাহ্, আল্লাহ্‌র রাসুল (দ.), ইসলামের প্রতি ইশ্‌ক-মহব্বত বিদ্যমান থাকে। আর সাধারণভাবেই তাঁর দুনিয়াবী জীবন অতিবাহিত হয়। এটি প্রাথমিক স্তর।

অপরদিকে কেউ কেউ ইশ্‌ক-মহব্বতের তীব্রতা কিংবা আধিক্যের কারণে ইসলামের রাহে নিজের জীবন-মাল কোরবানী দিতেও দ্বিতীয়বার ভাবেন না এবং এ কোরবানীর মাধ্যমে তাঁরা মানুষের অন্তররাজ্যে ইসলামের পতাকা সমুন্নত রাখেন। তাঁদের ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে, হে রাসুল (দ.), "বলুন, আমার সালাত, আমার সমগ্র ইবাদত, আমার জীবন-মরণ সবই বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্য নিবেদিত" –(সূরা আন'আম : ১৬২)। এ কোরআনী নীতির অনুসরণ করতে গিয়ে তাঁদের মধ্যকার কারও কারও ইশ্‌ক-মহব্বতের তীব্রতা এতোই গভীর ও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে, এক পর্যায়ে তাঁরা ইসলামের জাহেরী বিধান তথা ফিক্‌হের অনুবর্তী থাকতে পারেন না। ফলে আল্লাহ্‌র দ্বীনের তরে তাঁদের অনেক কোরবানী বা ত্যাগকে অনেক সময় আমাদের সাধারণ ও সাদা চোখে ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ড বলে মনে হতে পারে; ইসলামের আনুষ্ঠানিক বিষয়সমূহের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন বলে মনে হতে পারে। অথচ সেগুলো বস্তুত ইসলামের লঙ্ঘন নয় বরং সঙ্গত কারণেই মজজুব পরিস্থিতিহেতু অনেক সময় ইসলামের জাহেরী বিধান তথা ফিক্‌হের সাথে সরাসরি সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হয় না মাত্র। এ স্তরে সর্বপ্রথমে রয়েছেন আল্লাহ্‌র রাসুল (দ.)। সাথে রয়েছেন তাঁর সাহাবিগণ। এর সাথে রয়েছেন যুগে যুগে আগত আল্লাহ্‌র নবি, রাসুল, অলি, সুফি, দরবেশ, ফক্বিরগণ। উল্লেখ্য, ইসলাম হলো আমাদের তরে আল্লাহ্, আল্লাহ্‌র রাসুল (দ.)'র দেওয়া সুনির্দিষ্ট মূলনীতি। যা মোটাদাগে অপরিবর্তনশীল। আর ফিক্‌হ হলো এমন কতগুলো আইনের সংকলন, যেগুলো আল্লাহ্-রাসুল প্রদত্ত ইসলামি মূলনীতির আলোকে স্থান-কাল-পাত্র-পরিবেশ-প্রতিবেশ বিবেচনা করেথ বিজ্ঞ-প্রাজ্ঞ ইসলামি আইনজ্ঞগণ ফত্ওয়া হিসেবে প্রণয়ন করে ইসলামকে সাধারণ মানুষের অনুসরণের জন্য সহজতর করে দেন। এগুলো স্থান-কাল-পাত্র-পরিবেশ-প্রতিবেশ-পরিস্থিতি নির্ভর হয়ে থাকে। অর্থাৎ ইসলাম হলো এক অন্তহীন সমুদ্র, যা আল্লাহ্‌র ফিত্‌রতের অংশ। আর ফিক্‌হ হলো ইসলামের অনুসরণীয় বাহ্যিক দিক বা একটি শাখা। ইসলাম হলো একটি শরীর আর ফিক্‌হ হলো এর একটি অঙ্গ।

উপর্যুক্ত দ্বিতীয় স্তরের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহাপুরুষগণকে ইসলামি পরিভাষায় 'মাযহাবে ইশ্‌ক'-এর অনুসারী বলা হয়। মাযহাবে ইশ্‌ক অর্থ কোনো ব্যক্তির ক্বলবে বিদ্যমান ইশ্‌ক-মহব্বত তীব্র কিংবা অধিক হওয়ার কারণে ঐ ব্যক্তি এমন কোনো সুনির্দিষ্ট পন্থা বা চলনভঙ্গি অনুসরণ করা, যা প্রচলিত রীতি ও বিদ্যমান ফিকহের ঊর্ধ্বে। প্রসঙ্গত, এখানে মাযহাব বলতে প্রাসঙ্গিক কারণে আমাদের নিত্য-অনুসরণীয় চার মাযহাবের মতো অপর একটি কিংবা পঞ্চম কোনো মাযহাবকে বুঝানো হয়নি বরং এর ব্যবহারিক তাৎপর্য হলো, বান্দার যাবতীয় বন্দেগী শুধু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিবেদিত। এখানে আল্লাহ্ ব্যতীত দ্বিতীয় কিছুরই অবস্থান নেই। আর বান্দার এ ধরনের নিবেদিত অবস্থানের নাম ইশ্‌ক।

নবি, রাসুল, সাহাবি, অলি, সুফি, দরবেশ, ফক্বিরগণের মধ্যে মাযহাবে ইশ্‌কের অনুসরণ করেছেন–এমন উদাহরণ অসংখ্য-অজস্র। বোধগম্যতার সুবিধার্থে কয়েকটি উদাহরণ নিচে তুলে ধরা হলো :

এক. হযরত ইবরাহিম ও ইসমাঈল (আ.)'র কোরবানী। পিতা হযরত ইবরাহিম (আ.) নিজের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে তাঁর অনুমতি সাপেক্ষে কোরবানী দেওয়ার জন্য মাটিতে শুইয়ে দিয়েছেন। এমনকি গলায় ছুরিও চালিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে পুত্র ইসমাঈলের স্থলে অলৌকিকভাবে একটি পশু জবেহ হয়ে গেল, আর পুত্র ইসমাঈল সম্পূর্ণ অক্ষত থেকে গেলেন! (দ্রঃ আল্ কোরআন, ৩৭ : ১০২-১০৭)। সাধারণভাবে একজন মানুষকে জবেহ করে দেওয়ার বন্দোবস্ত করা কি প্রচলিত ইসলামি রীতি সম্মত? –না। বরং জীবন-মালের ক্ষতি না করার ব্যাপারে পবিত্র কোরআনের নির্দেশনা হচ্ছে, "তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না; নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু" –(সূরা নিসা : ২৯); "তোমরা নিজেদেরকে নিজেদের হাতে ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ

করো না” –(সূরা বাক্বারা : ১৯৫)। এই দুই আয়াতের মানদণ্ডে হযরত ইবরাহিম ও ইসমাঈল (আ.)'র কাজ আপত্তিকর। অথচ এই ব্যতিক্রমী ঘটনার মাধ্যমেই আল্লাহ্ তাঁর এই দুই নবি থেকে মহব্বতের পরীক্ষা নিয়েছেন এবং তাঁদের এ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তাঁরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন তাঁদের উপর যারপরনাই সন্তুষ্ট হয়েছেন। কারণ তাঁরা এখানে প্রচলিত ইসলামি রীতির ঊর্ধ্বে ওঠে 'মাযহাবে ইশ্‌ক'র অনুসারী ছিলেন। দুই. সাহাবায়ে কেরাম (রা.)'র কোরবানী। তাঁরা আল্লাহ্-রাসুল (দ.)'র সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়তে নিজেদের জীবন-মাল কোরবানী দিয়েছেন কোনো যদি-কিন্তু ছাড়াই। এছাড়া তাঁরা বিচ্ছিন্নভাবেও অনেক সময় এরূপ করেছেন। অথচ উপরে বর্ণিত 'সূরা নিসা ও সূরা বাক্বারার আয়াতে করিমার আলোকে যুক্তির বিবেচনায়' তাঁদের এ ঘটনাপঞ্জি আপত্তিকর মনে হবে। কিন্তু তাঁদের এহেন কোরবানীতে আল্লাহ্, আল্লাহ্‌র রাসুল (দ.) কতটা সন্তুষ্ট হয়েছেন, ইসলামের কতটা ওয়াফাদারি সাধিত হয়েছে–তা বলাই বাহুল্য। এখানে সাহাবায়ে কেরাম (রা.)ও প্রচলিত ইসলামি রীতির ঊর্ধ্বে ওঠে 'মাযহাবে ইশ্‌ক'র অনুসরণ করেছেন। উল্লেখ্য, আল্লাহ্-রাসুল (দ.)'র রাহে জীবন-মাল উৎসর্গ করে (সশস্ত্র সংগ্রাম অর্থে) জিহাদ করার ব্যাপারে পবিত্র কোরআন-সুন্নাহে যে নির্দেশাবলি রয়েছে, সেগুলো 'মাযহাবে ইশ্‌ক'র আওতাভুক্ত হিসেবে বিবেচিত হবে।

তিন. (ক) আল্লাহ্‌র রাসুল (দ.) যখন অজু করতেন তখন সাহাবায়ে কেরাম (রা.) তাঁর ব্যবহৃত পানি সংগ্রহ করে তা থেকে বরকত লাভ করার জন্য পানির উপর যেন হুমড়ি খেয়ে পড়তেন– (সহিহ্ বোখারি, হাদিস নং: ১৮৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশন) (খ) আল্লাহ্‌র রাসুল (দ.) হুদায়বিয়ার সন্ধির দিন যখনই কোনো শ্লেষ্মা ঝেড়ে ফেলছিলেন, তখনই তা সাহাবায়ে কেরাম (রা.) সংগ্রহ করার জন্য হাত পেতে দিচ্ছিলেন। ফলে তা কারও না কারও হাতে পড়ছিল। তারপর (বরকতস্বরূপ) ঐ সাহাবি তা তাঁর মুখমণ্ডল ও শরীরে মেখে নিচ্ছিলেন– (সহিহ্ বোখারি, ১ম খণ্ড, ১৬৮ নং পরিচ্ছেদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)।

এখানে দৃষ্টি আকর্ষণের বিষয় হলো, এ ধরনের ব্যতিক্রমী কাজ করার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) কিন্তু পবিত্র কোরআন-সুন্নাহ্‌র 'আক্ষরিক দলিল-প্রমাণ'র দ্বারস্থ হননি বরং তাঁদের ক্বলবে বিদ্যমান ইশ্‌ক-মহব্বতের তাড়নার জোরেই তাঁরা এমনটি করেছেন। যা তাঁদের দ্বারা বাস্তবায়িত 'মাযহাবে ইশ্‌ক'র প্রকৃষ্ট উদাহরণ এবং তা উম্মাহ্‌র চোখের সামনে সূর্যের মতো সুস্পষ্টরূপে বিদ্যমান।

চার. আল্লাহ্‌র রাসুল (দ.) পবিত্র মদিনায় হিজরত করার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র নির্দেশ পাওয়ার পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-কে ইঙ্গিত করলেন, 'যে-কোনো এক রাতে তাঁকে সাথে নিয়ে তিনি হিজরতের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন।' এ ইঙ্গিত পাওয়ার পর থেকে হিজরতের রাত পর্যন্ত হযরত সিদ্দিকে আকবর (রা.) রাতের বেলা কখনো ঘুমাননি, যাতে আল্লাহ্‌র রাসুল (দ.) তাঁকে হিজরতের উদ্দেশ্যে ডাকতে আসলে অতিরিক্ত ডাকতে গিয়ে রাসুলের কষ্ট না হয় এবং হিজরত-যাত্রায় ক্ষণকালও বিলম্ব না হয়। অর্থাৎ তিনি সেই বিশেষ সময়টাতে রাতের বেলা ঘুমাননি। অথচ পবিত্র কোরআনের সূরা নাবার ৯-১১ নম্বর আয়াতে করিমার মর্মার্থ হলো, রাতে ঘুমানোর মাধ্যমে শরীরকে বিশ্রাম দিতে হবে। এখানে সিদ্দিকে আকবর (রা.)ও প্রচলিত ইসলামি ফিকহের ঊর্ধ্বে ওঠে 'মাযহাবে ইশ্‌ক'র অনুসরণ করেছেন।

পাঁচ. হিজরতের রাতে আল্লাহ্‌র রাসুল (দ.) হযরত মওলা আলী (রা.)-কে নিজের বিছানায় শুইয়ে রেখে হিজরতের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন। মওলা আলীও দ্বিধাহীন চিত্তে শুয়ে পড়েছেন। অথচ তিনি জানতেন, প্রতিপক্ষ বিছানায় আল্লাহ্‌র রাসুলকে না পেয়ে তাঁকে পেলে তারা তাঁর জীবন পর্যন্ত নিয়ে নিতে পারে। কিন্তু তিনি এর পরোয়া করেননি। অথচ জীবন-মাল ঝুঁকিতে ফেলার বিষয়ে ইসলামের যে নিষেধাজ্ঞা আছে তা তো আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি। এখানেও 'মাযহাবে ইশ্‌ক'র অনুরণনই ঘটেছে।

ছয়. সেদিনের বিভীষিকাময় কারবালায় যা ঘটেছিল– ইমাম হোসাইন (রা.)'র পরিবারের সদস্যগণ শাহাদাতকে বরণ করেছেন, ইমাম স্বয়ং শাহাদাতকে বরণ করেছেন। অথচ জীবন-মালের নিরাপত্তার স্বার্থে শত্রুপক্ষকে বুঝদানের লক্ষ্যে হলেও শুধু মৌখিকভাবে অসঙ্গত কথা উচ্চারণ করাকে ইসলাম বৈধতা দিয়েছে। কিন্তু আহলে বাইতের ইশ্‌ক-মহব্বতের তীব্রতা এতোটাই বেশি যে, তাঁরা সপরিবারে শাহাদাতকে বরণ করে নিয়েছেন, তারপরও ভিন্ন পথ অবলম্বন করেননি। তাঁরা সপরিবারে জীবন উৎসর্গ করে 'মাযহাবে ইশ্‌ক'র রাস্তা মসৃণ করে গেছেন উম্মাহ্‌র সার্বিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে।

সাত. নফল ইবাদত। 'নফল' শব্দের অর্থই কর্তব্য বহির্ভূত অতিরিক্ত কাজ। এটি এমন ইবাদত, যা কোনো প্রকার নির্ধারিত বা আবশ্যিক কিছু নয় বরং বান্দার ইচ্ছাধীন। তাহলে প্রশ্ন, আবশ্যিক ইবাদত না হওয়ার পরও বান্দা এই ধরনের ইবাদত কেন করে? উত্তর হলো, 'ইশ্‌ক-মহব্বত'। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রতি ইশ্‌ক-মহব্বত থাকার কারণে যা না করলেও চলে, বান্দা তা-ও করে। এমনকি এই ইবাদত অতি থেকে অতিরিক্ত হওয়ার ফলে বান্দা আল্লাহ্‌র সাথে 'ফানা' (বিলীন) হয়ে যায়। যা প্রচলিত ভাষায় 'ফানা ফিল্লাহ্‌' অভিধায় পরিচিত। এই ফানার স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করছেন, "আমার (আল্লাহ্‌র) বান্দা সর্বদা নফল ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে। এমনকি নফল ইবাদতের আধিক্যের কারণে অবশেষে আমি তাকে আমার এমন প্রিয় পাত্র বানিয়ে নেই যে– আমিই তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শুনে; আমিই তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে; আমিই তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে; আর আমিই তার পা হয়ে যাই, যা দিয়ে সে চলে। সে যদি আমার কাছে কোনো কিছু চায়? তবে আমি নিশ্চয় তাকে তা দান করি। আর যদি সে আমার কাছে আশ্রয় চায়, তবে অবশ্যই আমি তাকে আশ্রয় দেই" –(সহিহ্‌ বোখারি, হাদিস নম্বর : ৬০৫৮, রিক্বাক্ব অধ্যায়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত)। এখানে স্বয়ং আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামিন মন্‌জিল (ফানা ফিল্লাহ্‌) পর্যন্ত নির্ণয় করে দিয়ে ইরশাদ করছেন যে, ইশ্‌ক-মহব্বতের আধিক্যের কারণে 'মাযহাবে ইশ্‌ক'র অনুসরণ করতে গিয়ে বান্দা এমন এক অবস্থায় উন্নীত হয় যা ইসলামি ফিকহের তুলনায় ব্যতিক্রম।

পরিশেষে, সচেতন পাঠকের বোধগম্যতার জন্য এর অধিক উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন। উপর্যুক্ত পর্যালোচনা আমাদেরকে এই ছায়াশিক্ষা দেয় যে, মুমিন-মুসলিমের ক্বলবে আল্লাহ্‌-রাসুল (দ.)'র তরে যে ইশ্‌ক-মহব্বত সৃষ্টি হয় তা তাঁদের অনেকের ক্ষেত্রে এতোটাই প্রবল হয়ে ওঠে যে, এক পর্যায়ে তাঁরা বিশেষ একটি দৃষ্টিকোণের পর্যায়ভুক্ত হয়ে যান– যা ইসলামে 'মাযহাবে ইশ্‌ক' নামে পরিচিহ্নিত। আর তাঁদের মাধ্যমে অনেক সময় এমন এমন ইসলামি খেদমত বা কর্মকাণ্ড প্রকাশিত হয়ে পড়ে, যা অনেক সময় প্রচলিত ইসলামি ফিকহের তুলনায় ব্যতিক্রম হলেও মূলত ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক নয় বরং তাঁরা তা আল্লাহ্‌-রাসুল (দ.)'র রেযামন্দির পথ অনুসারেই করে থাকেন। কাজেই সুস্পষ্ট যে, এ ধরনের কর্মকাণ্ড আমরা আমাদের সাধারণ বিবেচনায় বুঝে ওঠতে না পারলেও এগুলোর প্রতি নিঃশর্ত বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা রাখা এবং সবর ইখতিয়ার করাই আমাদের ঈমানী স্বাস্থ্যের জন্য কল্যাণকর।

মহান রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে উপর্যুক্ত 'মাযহাবে ইশ্‌ক'র অনুসারীগণের ওয়াসিলায় তাঁর রেযামন্দির পথে জীবন অতিবাহিত করার তাওফিক দান করুন– আমিন।

মযহাবে ইশ্‌ক সম্পর্কে মাখদুমে জাঁহা হযরত শায়খ শারফুদ্দীন আহমদ ইয়াহইয়া মানেরী (রহ.)'র উক্তি

১. "বলা হয় বেহেশ্‌ত হলো আতিথেয়তার স্থান, সেখানে এমন আতিথেয়তা যেখানে মেজবানের সাক্ষাত নাই, তবে এই আতিথেয়তা কোন কাজে আসবে? যখন তাঁর শত্রু ও মিত্র উভয়েই পর্দাবৃত, তবে এতদুভয় শ্রেণির মাঝে পার্থক্য রইল কোথায়?"

২. হাদিস শরিফের আলোকে ইশ্‌কের বর্ণনা; "তোমার পক্ষে যতটুকু সম্ভব বুদ্ধি-বিবেক হতে পর হয়ে যাও, বুদ্ধিকে ধ্বংস করো এবং উন্মাদ হয়ে যাও। কারণ বুদ্ধি ও যুক্তিসহকারে তুমি যদি আমার নিকট আস, তাহলে জেনে রাখো যে, আমার গলিতে অসংখ্য তীর ও বর্ষার আঘাত সইতে হবে। তবে হ্যাঁ, তুমি যদি প্রেমিকের অন্তর্ভুক্ত হও তাহলে তোমার সাথে কারো কোন আপত্তি থাকবে না" –(মাকতুবাতে দো সদী-তৃতীয় খণ্ড : পৃষ্ঠ : ৫৯-৬১)।

অলিকুল শিরোমনি হযরত এয়াছিন শাহ্ (র.) ও তাঁর দরবারের আধ্যাত্মিক মহিমা

♦ ইবনুল আহমদ ♦

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত চট্টগ্রাম বিভাগ শুধু একটি ভৌগোলিক অঞ্চল নয়, এটি ইসলামের এক ঐতিহাসিক প্রবেশদ্বার। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই ভূমি অলি-আউলিয়া, পীর-বুজুর্গ এবং ধর্মপ্রচারকদের পদধূলিতে পবিত্র হয়েছে। বার আউলিয়ার পুণ্যভূমি হিসেবে পরিচিত এই চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলার মাটিতে এমনই একজন মহান অলি-আল্লাহ্‌র স্মৃতি আজও জীবন্ত হয়ে আছে তিনি হযরত এয়াছিন শাহ্ (র.)।

রাউজান উপজেলার উত্তর সর্তা নিবাসী হযরতুল আল্লামা আলহাজ দেলওয়ার হোসাইন সাহেব, যিনি দেলা মিয়া হুজুর নামে পরিচিত, তিনি স্বপ্নযোগে হযরত এয়াছিন শাহ্ (র.)-এর নুরানি সুরত দেখেন। তাঁর মুখে যে বর্ণনা শুনেছিলাম তা আমার হৃদয়ে গভীর ছাপ ফেলে। সেই স্মৃতি থেকেই আজকের এই লেখার প্রেরণা।

রাউজান চট্টগ্রামের একটি ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা। হালদা নদীর তীর ঘেঁষে গড়ে ওঠা এই জনপদ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর। এই অঞ্চলে ইসলামের প্রসার ঘটেছে বহু অলি-বুজুর্গের পবিত্র পদচারণা এবং প্রচেষ্টায়। তাঁরা এখানকার মানুষদের মধ্যে তাওহিদের বীজ বপন করেছেন, নৈতিকতার শিক্ষা দিয়েছেন এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামী আদর্শ অনুসরণের পথ দেখিয়েছেন।

রাউজানের উত্তরাঞ্চলে যে এলাকায় আজ এয়াছিন নগর গ্রাম অবস্থিত সে এলাকায় এক সময় মগদের বসবাস ছিলো। হযরত এয়াছিন শাহ্ (র.)-এর মাধ্যমে এই অঞ্চলে ইসলামের প্রচার ও প্রসার হয় বলে কিংবদন্তি আছে। পরবর্তীতে এই মহান অলির সম্মানার্থে অত্র গ্রামের নাম এয়াছিন নগর রাখা হয়।

প্রচলিত মত অনুযায়ী, এই মহান অলি সুদূর আরব থেকে এসেছিলেন নবিজি হযরত মুহাম্মদ (দ.)-এর স্বাপ্নিক নির্দেশে। বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে সুফি সাধকদের ভূমিকা অতুলনীয় এবং ঐতিহাসিক। তাঁরা কেবল ধর্মীয় বিধান শেখাননি বরং আত্মার পরিশুদ্ধি, মানবিক মূল্যবোধ এবং আল্লাহ্‌র প্রতি গভীর ভালোবাসার পথ দেখিয়েছেন। সুফিবাদের এই মানবিক আবেদনই ইসলাম ধর্মকে সাধারণ মানুষের কাছে এতটা গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিল।

হযরত এয়াছিন শাহ্ (র.) বিস্তৃত পৃথিবীর বৃহত্তর সুফি ঐতিহ্যেরই একজন প্রতিনিধি। তাঁর জীবন ও কর্ম এই দীর্ঘ আধ্যাত্মিক ধারারই একটি অংশ, যা আজও মানুষকে হকের পথে ডাকছে।

হযরত এয়াছিন শাহ্ (র.) সম্পর্কে সবচেয়ে বড় সত্য হলো, তাঁকে নিয়ে লিখিত কোনো নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক দলিল আজ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাঁর জন্ম তারিখ, ইন্তিকালের তারিখ, কোন বংশে জন্মেছিলেন, কোথায় শৈশব কেটেছে এসব প্রশ্নের উত্তর আজও রহস্যের আবরণে ঢাকা। তবে এলাকার মুরুব্বি আলেম ও বুজুর্গদের মতামত এবং মৌখিক ইতিহাসের ভিত্তিতে যা জানা যায় তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এলাকার প্রখ্যাত আলেম-ওলামা ও পীর-বুজুর্গদের জরিপ এবং মতামত অনুযায়ী হযরত এয়াছিন শাহ্ (র.) একজন বিশুদ্ধ আরবীয় বংশোদ্ভূত কামেল অলি-আল্লাহ্। তিনি আরবস্থান থেকে এসেছিলেন বলে জানা যায়। কেউ কেউ মনে করেন তিনি সরাসরি নবিজির বংশধর আওলাদে রাসুল।

হযরত এয়াছিন শাহ্ (র.) কবে এই অঞ্চলে এসেছিলেন তা নির্দিষ্টভাবে জানা না গেলেও বিভিন্ন নিদর্শন ও পারিপার্শ্বিক তথ্য বিশ্লেষণ করলে অনুমান করা যায় যে, এটি কয়েক শতাব্দী আগের ঘটনা। চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচারের যে সোনালি অধ্যায় রচিত হয়েছিল মধ্যযুগে, সেই সময়কালেই তিনি এখানে এসেছিলেন বলে ধারণা করা হয়।

তিনি এসেছিলেন আল্লাহ্‌র রাসুল (দ.)-এর মিশনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। এই মাটির মানুষদের ঈমানের আলোয় আলোকিত করতে, তাদের হৃদয়ে কলেমায়ে তাওহিদের বীজ বপন করতে।

স্থানীয় ইতিহাস অনুযায়ী তিনি যখন এই অঞ্চলে আসেন তখন এখানকার অনেক মানুষ ছিলেন গোমরাহির পথে। ধর্মীয় বিভ্রান্তি, কুসংস্কার ও অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবে ছিলেন তারা। হযরত এয়াছিন শাহ্

(র.) তাঁর জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও আধ্যাত্মিক শক্তির মাধ্যমে এই মানুষদের ইসলামের পথে এনেছেন। তাঁর সংস্পর্শে এসে অনেক মানুষ পথ খুঁজে পেয়েছিলেন।

ইসলামী পরিভাষায় 'কামেল অলি' বলতে এমন একজন সাধককে বোঝায়, যিনি আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছেন। যাঁর হৃদয় থেকে সমস্ত দুনিয়াবি কামনা-বাসনা দূর হয়ে গেছে এবং শুধু আল্লাহ্‌র রেজামন্দি হাসিলই যাঁর একমাত্র লক্ষ্য। হযরত এয়াছিন শাহ্ (র.) এই উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন বলে এলাকার আলেম-বুজুর্গরা একমত।

তাঁর মাজার শরিফে আজও প্রতিদিন মানুষ আসেন এবং তাঁর রূহানি ফয়েজ লাভ করেন। তাঁর কামালিয়াতের একটি বিশেষ দিক হলো এই দরবারে আদব রক্ষার প্রতি কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। স্থানীয়রা বলেছেন, এই মহান অলির মাজারের সামনে দিয়ে গেলে বিশেষ সতর্কতা রক্ষা করতে হয়। যানবাহনের চালকরা যদি তাঁর মাজার সম্মুখস্থ রাস্তায় অসাবধানভাবে চলাচল করেন, তাহলে নানা ধরনের বিপদ হতে পারে বলে তাদের বিশ্বাস। বাস্তব অভিজ্ঞতা মানুষকে এ ধরনের সতর্কতা অবলম্বনে দৃঢ় করেছে।

হযরত এয়াছিন শাহ্ (র.)-এর মাজার শরিফ দীর্ঘকাল স্থানীয় মানুষদের কাছে অজানা ছিল। পরবর্তী সময়ে হযরত আবদুল হামিদ শাহ্ (র.) (প্রকাশ ডাক্তার ফকির) ও হযরত আব্দুর রশীদ (র.) (প্রকাশ গদা মৌলভী) এবং হযরত আব্দুল গফুর মাস্টার (র.) (প্রকাশ মাস্টার হুজুর)-এর নির্দেশে হাতের লাঠি দ্বারা সীমানা নির্ধারণ করে দেওয়ার প্রেক্ষিতে হযরত এয়াছিন শাহ্ (র.)-এর মাজার শরিফ ও সমাধিস্থল এলাকা বাসীর কাছে সনাক্তকরণ হয়। সনাক্তকরণের পূর্বে ঐ স্থানে একটা বিশাল বটগাছ ছিল, তার আশে পাশে অনেক ধরনের অলৌকিক আশ্চর্যময় ঘটনার অবতারণা হয়। তার পার্শ্বে একটা পুকুর রয়েছে যা এখনো বিদ্যমান। সবগুলো মিলে এখানে সংঘটিত হত নানাপ্রকার আশ্চর্যজনক বৈচিত্র্যময় ঘটনা প্রবাহ। তখনকার সময়ের জনসাধারণের নিকট এ সকল অলৌকিকতা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমাদৃত। সাধারণ মানুষেরা প্রাথমিক অবস্থায় বুঝতে না পারলেও পরক্ষণে যখনই পবিত্র মাজার শরিফ বা সমাধিস্থলের সন্ধান মিলে তখনই সকলের নিকট জানা হয়ে যায়, সকল জল্পনা কল্পনা ও প্রশ্নের সমাধান হয়ে যায়। এইভাবে এয়াছিন শাহ্ (র.)-এর মাজার শরিফ এখন ঐশী অলৌকিকতার নিদর্শন হিসেবে স্থিত হয়ে আছে।

হযরত এয়াছিন শাহ্ (র.)-এর মাজার পাকের সন্ধান লাভের আগে ও পরে অনেক কারামতের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। যার অজস্র প্রমাণাদি বিদ্যমান। এখনো দিবারাত্রি তাঁর দরবারে ফুয়ুজাত ও কারামত অহরহ জারি রয়েছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে যে ঘটনাটি সরাসরি প্রত্যক্ষ করেছি এবং শুনেছি, তা উল্লেখ করছি।

একটি ঘটনা আমার নিজের জীবনের সাথে সম্পর্কিত। আমাদের যাদের বাসা মাজার শরিফ এলাকায় আছে, আমরা ফজরের নামায শেষ করে হযরত এয়াছিন শাহ্ (রহ.)-এর দরবারে হাজিরা দিয়ে আমাদের দৈনন্দিন কাজ শুরু করি। আমার বাসা মাজার শরিফের নিকটে হওয়ায় আমিও এর ব্যতিক্রম নই। কলেজে অধ্যয়নকালে আমার ইন্টারের টেস্ট পরীক্ষা চলাকালীন ইসলামের ইতিহাস সাবজেক্টের পরীক্ষা ছিল। সাবজেক্টটি আমার কাছে খুব বেশি কঠিন মনে হতো না। যার কারণে আলসেমি করে আমি ঘুম থেকে উঠতে দেরি করে ফেলি। তড়িঘড়ি করে পরীক্ষা দিতে চলে যাই। চিন্তা করলাম পরীক্ষা শেষে রওজা পাকে হাজিরা দিব। কিন্তু সেদিন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র দেওয়ার পূর্বেই যেকোনো একটি কারণে আমাকে পরীক্ষা থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হয়। সেই মুহূর্তে মনে হলো, বাবাজান এয়াছিন শাহ্ (র.)-এর দরবারের সাথে গাফেলতির কারণে এই পরিণতিই আমার ভোগ করতে হলো। আরেকটি ঘটনা আরো বেশি চমকপ্রদ। যা আমার মরহুমা দাদীর কাছে শুনেছিলাম। বেশ কিছু বছর আগে আমাদের এলাকার কিছু যুবক ড্রাইভিং শেখার জন্য একটি প্রাইভেটকার ভাড়া করে। তারা প্রতিদিন মাজার শরিফের সামনের রাস্তায় অনুশীলন করত। একদিন দুপুরবেলা হঠাৎ গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সরাসরি মাজারের পূর্বপাশের পুকুরে গিয়ে পড়ে। গাড়িটি পানিতে পড়ার ধরনটি ছিল আশ্চর্যজনক। গাড়িটি হেলিকপ্টারের মতো একটা অদ্ভুত ভারসাম্যের সাথে পানির উপর বসে গেল। আশ্চর্যের বিষয়, গাড়িতে তিন-চারজন যাত্রী থাকলেও কেউ হতাহত হননি। এটিকে এলাকার মানুষ হযরত এয়াছিন শাহ্ (র.)-এর কারামত হিসেবেই দেখেন।

হযরত এয়াছিন শাহ্ (র.)-এর দরবারে মানুষ বিভিন্ন সুখ-দুঃখ, প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আসেন। কেউ আসেন রোগমুক্তির জন্য, কেউ আসেন সন্তানের জন্য, কেউ আসেন ব্যবসার উন্নতির জন্য, কেউ আসেন পারিবারিক সমস্যা সমাধানের জন্য। তাঁর দরবারে গরু, ছাগল, মহিষ, হাঁস, মুরগি, কবুতর এবং নগদ অর্থ মানত করা হয়।

যাঁরা সৎ নিয়তে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস রেখে এই দরবারে এসেছেন, তাঁরা অনেকেই তাঁদের হাজত পূরণ হতে দেখেছেন। এটি কোনো অন্ধ বিশ্বাস নয়, বরং সত্য ও বাস্তব হিসেবে বিদ্যমান।

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, অলি-আল্লাহ্‌দের দরবারে মানত করা বা দোয়া চাওয়া সরাসরি আল্লাহ্‌র কাছেই চাওয়া। কারণ আল্লাহ্‌র অলিরা নিজেরা কিছু দেন না বরং তাঁরা আল্লাহ্‌র কাছে ওসিলা বা মাধ্যম হিসেবে কাজ করেন। এই বিশ্বাসই মানুষকে তাঁর দরবারে আসতে অনুপ্রাণিত করে।

হযরত এয়াছিন শাহ্ (র.)-এর মাজার সংলগ্ন পুকুরের পানির বিশেষ ফজিলত নিয়ে এলাকায় অনেক কথা প্রচলিত আছে। মাজার সনাক্তের পর থেকে এই পুকুরের পানি পান করে বহু মানুষ কঠিন রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করেছেন বলে জানা যায়। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষ এই পানির উপকার ভোগ করেছেন। একটি বিশেষ তথ্য প্রবীণদের কাছে শোনা যায়– পুকুর থেকে পানি নেওয়ার সময় যদি হাতের নখে পানি লাগত বা আঙুল পানিতে ডুবে যেত, তাহলে সেই নখ ঝরে পড়ে যেত। এটি একটি অদ্ভুত ঘটনা, যা পুকুরের পানির অলৌকিক শক্তির প্রমাণ বলে মনে করা হয়। বর্তমানে পুকুরের পানি পাত্রে ভরে মাজারে রাখা হয়, যাতে যিয়ারতকারীরা সাচ্চা নিয়তে পান করতে পারেন।

পুকুরটির খনন সম্পর্কে লোককথা হলো– এটি গায়েবিভাবে হয়েছে। এতে অসংখ্য প্রজাতির মাছ ছিল, কিন্তু কেউ মাছ ধরার সাহস করত না। একবার এক ব্যক্তি ওই পুকুর থেকে মাছ ধরে বাজারে বিক্রি করেছিলেন। কথিত আছে, সেই মাছ কেটে রান্না করার জন্য লবণ মরিচ মাখিয়ে কড়াইয়ে দেওয়ার পরেও লাফালাফি করছিল। আর যে ব্যক্তি মাছ ধরেছিলেন, তিনি পরবর্তীতে ভয়াবহ শারীরিক কষ্টে পড়েছিলেন বলে জানা যায়। এই ঘটনার পর থেকে সবাই পুকুরের পবিত্রতা রক্ষায় সজাগ হয়ে যান। কিংবদন্তি আছে, এককালে অত্র এলাকায় কারো বিবাহ কিংবা যেকোনো সামাজিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হলে ঐ পুকুরে কিস্তি (নৌকা) করে হাঁড়ি পাতিল সহ একটি অনুষ্ঠানের আনজাম দেওয়ার জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা ভেসে উঠতো। তা আজও মাজার সংক্রান্ত যেকোনো পানসল্লায় (মিটিং) আলোচনা হয়।

হযরত এয়াছিন শাহ্ (র.)-এর দরবারের সবচেয়ে বড় অবদান হলো মানুষের জীবনে নৈতিক পরিবর্তন আনা। তাঁর রূহানি শক্তির প্রভাবে এলাকার অনেক বিপথগামী মানুষ সঠিক পথে ফিরেছেন। ছাত্র-যুবক থেকে শুরু করে মহিলা পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ তাঁর দরবারের সোহবতে এসে জীবন পরিবর্তন করেছেন।

যাঁরা আগে মদ্যপান, জুয়া বা অন্যান্য অসামাজিক কাজে লিপ্ত ছিলেন তাঁদের অনেকেই তাঁর দরবারের প্রভাবে সেই পথ ছেড়ে নামায-রোজায় মনোযোগী হয়েছেন। এই পরিবর্তন কোনো বাহ্যিক চাপে নয় বরং অভ্যন্তরীণ অনুপ্রেরণায় হয়েছে, যা সত্যিকারের আধ্যাত্মিক শক্তির প্রমাণ।

এলাকার মানুষদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ভালোবাসা বৃদ্ধিতেও এই মাজারের ভূমিকা আছে বলে মনে করা হয়। কোনো সমস্যা বা বিবাদ দেখা দিলে মানুষ মাজারে এসে দোয়া করেন এবং প্রায়ই দ্রুত সমাধান পান।

মুরুব্বিরা বলেন, হযরত এয়াছিন শাহ্ (র.)-এর রূহানি শক্তির প্রভাবে এলাকায় বড় কোনো দুর্যোগ বা অঘটন হয়নি বললেই চলে। যখনই কোনো সমস্যা দেখা দিয়েছে, অদৃশ্যভাবে তা সমাধান হয়ে গেছে। এলাকার মানুষ বিশ্বাস করেন যে, মহান এই অলির রূহানি পাহারায় তাদের গ্রাম ও পরিবার সুরক্ষিত। এই বিশ্বাস মানুষের মধ্যে একটি মানসিক নিরাপত্তাবোধ তৈরি করেছে, যা সামাজিক স্থিতিশীলতায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। মানুষ যখন জানে যে তাদের পাশে একজন মহান অলির রূহানি উপস্থিতি আছে, তখন তারা অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী ও শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারে।

হযরত এয়াছিন শাহ্ (র.)-এর মাজারকে কেন্দ্র করে এলাকায় একটি সক্রিয় ধর্মীয় পরিবেশ গড়ে উঠেছে। মাজারে নিয়মিত মিলাদ-কিয়াম, দোয়া ও জিকিরের আসর হয়। প্রতিবছর ১০ চৈত্র মহাসমারোহে বার্ষিক উরশ শরিফ উদযাপিত হয়। বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে যেমন– শবে বরাত, শবে কদর, শবে মিরাজের রাতে বিশেষ আয়োজন থাকে– যেখানে দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ আসেন।

এই ধর্মীয় পরিবেশ এলাকার মানুষের মধ্যে ইসলামী জ্ঞান ও সংস্কৃতির বিকাশে সহায়তা করছে। বিশেষত তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের প্রসারে মাজারটি একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করছে।

হযরত এয়াছিন শাহ্ (র.)-এর মাজার শরিফের উন্নয়নে এবং তাঁর নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলায় যে মানুষটির অবদান সবচেয়ে বেশি, তিনি হলেন হলদিয়া ইউনিয়নের প্রাক্তন চেয়ারম্যান, বিশিষ্ট সমাজসেবক, দানবির ও ইসলামী চিন্তাবিদ মরহুম আলহাজ এম. আবদুল ওহাব বি.এ, বি.এড মাইজভাণ্ডারী (র.)।

তিনি ছিলেন বাবা ভাণ্ডারী কেবলার ছোট শাহজাদা হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ শফিউল বশর মাইজভাণ্ডারীর মুরিদ এবং মাইজভাণ্ডারী লেখক ও গবেষক মাওলানা গোলাম মোস্তফা মোহাম্মদ শায়েস্তা খান আজহারীর পিতা। তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও নেতৃত্বে মাজার কমিটি সংগঠিত হয় এবং পবিত্র রওজা শরিফ পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু হয়।

দীর্ঘ বছর ধরে মাজারটি তেমন কোনো কাঠামোগত উন্নয়ন ছাড়াই ছিল। আলহাজ ওহাব মাইজভাণ্ডারীর তত্ত্বাবধানে একটি সুন্দর ও মর্যাদাসম্পন্ন মডেলে মাজার পুনর্নির্মাণের কাজ সমাপ্ত করা হয়। নতুন কাঠামোটি মাজারের গাম্ভীর্য ও পবিত্রতাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে এবং দর্শনার্থীদের জন্য একটি উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করেছে।

হযরত এয়াছিন শাহ্ (র.)-এর নাম ও স্মৃতিকে চিরস্থায়ী করতে আলহাজ আবদুল ওহাব সাহেব বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন, যা আজও উত্তর রাউজানের শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

হযরত এয়াছিন শাহ্ পাবলিক বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় ও হযরত এয়াছিন শাহ্ পাবলিক কলেজ রাউজানের আমিরহাটে অবস্থিত। এই বিদ্যালয় ও কলেজটি উত্তর রাউজানের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বহু বছর ধরে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে হাজারো শিক্ষার্থী শিক্ষা লাভ করে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

এছাড়া মাজার সংলগ্ন হযরত এয়াছিন শাহ্ (র.) নুরানী মাদ্রাসা, এয়াছিন শাহ্ সড়ক, এয়াছিন নগর গ্রামের নামকরণ এগুলো সবই প্রমাণ করে যে হযরত এয়াছিন শাহ্ (র.) কেবল একজন আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব নন, বরং তিনি এই অঞ্চলের পরিচয়েরই এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

হযরত এয়াছিন শাহ্ (র.)-এর কারামতগুলো আমাদের শিক্ষা দেয় আদব ও বিনয় কতটা জরুরি। আল্লাহ্‌র অলিদের প্রতি অবজ্ঞা বা অমনোযোগিতা বিপদ ডেকে আনতে পারে, আবার তাঁদের প্রতি সম্মান ও ভক্তি মানুষকে আল্লাহ্‌র নৈকট্যের দিকে নিয়ে যায়।

এই শিক্ষা শুধু মাজার সংক্রান্ত নয়, বরং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বড়দের সম্মান, ওস্তাদের প্রতি আদব, পীর-বুজুর্গদের প্রতি শ্রদ্ধা এগুলো আমাদের চরিত্রকে সুন্দর করে এবং আল্লাহ্‌র দরবারে আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে।

ইসলামের ইতিহাসে অলি-আল্লাহ্‌দের একটি ধারাবাহিক শৃঙ্খল রয়েছে, যা নবি করিম (দ.) থেকে শুরু হয়ে আজ পর্যন্ত চলে আসছে। প্রতিটি যুগে আল্লাহ্ তা'য়ালা এমন কিছু মানুষকে পাঠিয়েছেন, যাঁরা তাঁর দ্বীনকে জীবন্ত রাখেন এবং মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

এই শৃঙ্খলের একটি গুরুত্বপূর্ণ কড়ি হলেন হযরত এয়াছিন শাহ্ (র.)। তিনি তাঁর সময়ে এই অঞ্চলের মানুষদের জন্য যে আলো জ্বালিয়েছেন, তা আজও নিভে যায়নি। বরং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সেই আলো ছড়িয়ে পড়ছে।

শতাব্দীর পর শতাব্দী কেটে গেছে। পৃথিবীর রাজনৈতিক মানচিত্র বদলেছে। সভ্যতার উত্থান-পতন হয়েছে। কিন্তু হযরত এয়াছিন শাহ্ (র.)-এর মশাল আজও নিভেনি। রাউজানের আমিরহাট বাজার হতে এক কিলোমিটার উত্তরে এয়াছিন নগরের মাটিতে তাঁর পবিত্র সমাধি আজও খোদা তালাশি বান্দাগণের নিরাপদ আশ্রয় স্থল।

এই মহান অলির জীবন ও কারামত আমাদের শেখায় যে, মানুষের প্রকৃত শক্তি তার ঈমানের গভীরতায়, তার আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কের নিবিড়তায়। বাহ্যিক ক্ষমতা, সম্পদ বা প্রতিপত্তি নয়, বরং আল্লাহ্‌র নৈকট্যই মানুষকে সত্যিকার অর্থে মহান করে।

চট্টগ্রামের রাউজানে ইসলাম প্রচারের দীর্ঘ ইতিহাসে হযরত এয়াছিন শাহ্ (র.) একটি অপরিহার্য অধ্যায়। তাঁকে ছাড়া এই ইতিহাস অসম্পূর্ণ। তাঁর অবদানকে স্মরণ করা, তাঁর আদর্শ অনুসরণ করা এবং তাঁর নামে গড়া প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরো সমৃদ্ধ করা এটাই হোক আমাদের প্রতিশ্রুতি।

হযরত এয়াছিন শাহ্ (র.)-এর দরগাহে কোটি কোটি দরুদ ও সালাম। তাঁর পুণ্যস্মৃতি চিরজীবী হোক। তাঁর আলো যুগের পর যুগ মানুষের হৃদয় আলোকিত করুক। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন আমাদের সকলকে তাঁর রূহানি ফয়েজ দান করুন। আমিন, ইয়া রাব্বাল আলামিন।

মানবসৃষ্টির মূল ঐশীপ্রেম

♦ মোহাম্মদ সাজীদুল হাসান চৌধুরী ♦

(পূর্ব প্রকাশিতের পর : শেষ পর্ব)

আগের পর্বের শেষ অংশে বিচ্ছেদের কথা উঠে এসেছে। বিচ্ছেদ ঐশীপ্রেমের একটি অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। যারা স্রষ্টার বিশেষ দয়াধন্য তাঁরাই কেবল আল্লাহ্র বিশালত্ব ও সর্বব্যাপী অস্তিত্ব স্পষ্টত উপলব্ধি করতে পারেন। একইসাথে তাঁরা নিজের ক্ষুদ্রতা ও বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কে খুব বাস্তব ধারণা লাভ করেন। বিশ্ববিখ্যাত সুফি, কবি ও ইসলামিক স্কলার, মাওলানা জালালুদ্দিন মুহাম্মাদ রুমি (র.) প্রদত্ত একটি বিখ্যাত উদাহরণ এই প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক,

বেশনু আয্ ন্যায় চূঁ হেকায়েত মী কুনাদ
ওয়ায্ জুদাঈহা শেকায়েত মী কুনাদ
কায্ নয়িস্তাঁ তা' মারা' বুবরিদেআন্দ
দার নাফিরাঁ মার্দ ও জান না'লিদেআন্দ।

বাংলা অনুবাদ: শোনো এই বংশীধ্বনি কী অভিযোগ করছে, সে তো তার বিরহ-বেদনার কাহিনী বর্ণনা করছে। সে বলছে– যবে থেকে আমাকে সেই নলখাগড়ার বন (মূল উৎস) হতে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে, তবে থেকে আমার ক্রন্দনে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই ব্যথিত হয়েছে।

তিনি উল্লেখ করেছেন, মূল হতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আর্তনাদই বাঁশীর করুণ সুর, যা সকলকে ব্যথিত করে। মূলত মানুষের রূহ তাঁর মূল তথা আল্লাহ্ তা'আলার মহান সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রতিনিয়ত আকুল হয়ে কান্নায় রত। সেই কান্না কেবল অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরা অনুভব করতে সক্ষম। মানুষের দুটি পরিচয়, একটি রূহানি আরেকটি নাসুতি বা জিসমানি। রূহের মাধ্যমে রূহানি সম্পর্কে মহান আল্লাহ্র সত্তার সাথে মানুষের সম্পর্ক, একেই আধ্যাত্মিক (ঝঢ়রৎরঃঁধষ) সম্পর্ক বলা হয়। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, "অতঃপর তিনি তাকে (মানুষকে) সুঠাম করলেন এবং তাতে তাঁর রূহ থেকে ফুঁকে দিলেন এবং তোমাদেরকে দিলেন কান, চোখ ও অন্তঃকরণ। তোমরা খুব সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো" (সূরা আস্-সাজদাহ্ : ০৯)। এছাড়া সূরা আল-হিজর : ২৯ এবং সূরা সোয়াদ-এর : ৭২ নং আয়াতে একইভাবে ইরশাদ হয়েছে, "অতঃপর যখন আমি তাকে সুঠাম করব এবং তাতে আমার রূহ্ থেকে ফুঁকে দেব, তখন তোমরা তার (আদমের) সামনে সেজদায় অবনত হয়ো"। এই আয়াতগুলোতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মহান সত্তার অংশ হতে মানুষের শরীরে রুহ বা আত্মা দান করেছেন। আল্লাহ্র পরম অস্তিত্ব ভিন্ন সৃষ্টির শুরুতে কারও অস্তিত্ব ছিল না। সকল সৃষ্টির শুরু আল্লাহ্ তা'আলা হতেই এবং একসময় সকলেই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ফিরে যাবে। কোরআনে বলা হয়েছে, "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" –(সূরা আল-বাক্বারাহ্ : ১৫৬)। অর্থ: "নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ্রই এবং নিশ্চিতভাবে আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী"। উপমহাদেশের প্রখ্যাত উর্দু কবি মির্জা গালিবের একটি বিখ্যাত পঙক্তি এখানে প্রাসঙ্গিক:

'না থা কুছ তো খোদা থা, কুছ না হোতা তো খোদা হোতা,
ডুবোয়া মুঝকো হোনে নে, না হোতা ম্যায় তো কেয়া হোতা!'

অনুবাদ: যখন কিছু ছিল না, তখন খোদা ছিলেন। যদি কিছু না-ও থাকতো, তবুও তিনি থাকতেন। আমার এই অস্তিত্বই আমাকে ডুবিয়েছে; আমি যদি 'আমি' না হতাম, তবে আমিই কি খোদা হতাম না?

এখানে কবি বুঝাতে চেয়েছেন, যদি মানবজাতি বা সৃষ্টির শুরু না হতো, তাহলে আল্লাহ্ পাকের অস্তিত্বে সকলে একীভূত থাকতো। পরে আল্লাহ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্রষ্টা ও সৃষ্টি, দুটি ভাগে বিভক্ত হয়েছে। সৃষ্টি যদি নিজের আলাদা অস্তিত্ব ভুলে স্রষ্টার সাথে রূহানি সংযোগ স্থাপন করতে পারে, তবেই সে পুনরায় স্রষ্টা বা আল্লাহ্র সাথে মিলিত হতে পারবে। যারা পরম স্রষ্টার সান্নিধ্য প্রার্থনা করেন, তাঁরা আমিত্ব বলতে কোনকিছু তাঁদের মধ্যে যেন অবশিষ্ট না থাকে সেই চেষ্টায় সচেষ্ট থাকেন। এর পরবর্তীতে তাঁরা যখন স্রষ্টার পরম অস্তিত্বে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত থাকেন তখন তাঁদের মাঝে আর খোদার মাঝে ব্যবধান থাকে কেবল দুনিয়াবি শরীর বা পরিচয়। মহাকবি হাফিজ শিরাজি (র.) তাঁর দিওয়ানে লিখেছেন:

"মিয়াঁ-এ আশেক ও মাশুক হিচ হাইল নিস্ত, তু খোদ হেজাবে খোদী হাফিজ অয মিয়াঁ বরখিজ"।

অর্থ: "প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের মাঝে অন্য কোনো বাধা নেই; হে হাফিজ! তুমি নিজেই নিজের পর্দা, নিজেকে মাঝখান থেকে সরিয়ে দাও (তবেই মিলন ঘটবে)"। শেখ ফরিদুদ্দিন

আত্তার (র.) তাঁর 'মানতিকুত্ তোয়ায়ের' (পাখিদের সম্মেলন) গ্রন্থে দেখিয়েছেন, হাজারো পাখি যখন তাদের রাজা 'সিমুরগ'-এর খোঁজে যাত্রা শুরু করে, তখন তারা সাতটি উপত্যকা অতিক্রম করে। বিরহ হলো সেই দীর্ঘ যাত্রার কষ্ট, আর যখন তারা গন্তব্যে পৌঁছায়, তখন দেখতে পায় তারা নিজেরাই সেই পরম সত্তার অংশ। এটিই হলো প্রকৃত মিলন বা বেসাল।

ঐশী প্রেমের গূঢ় রহস্য বুঝতে হলে মানুষের আত্মিক জাগরণের পর্যায়গুলো অনুধাবন করা জরুরি। মানবাত্মা যখন এই ধুলোবালির পৃথিবীতে এসে নিপতিত হয়, তখন সে তার আদি আবাসের কথা ভুলে গিয়ে জাগতিক মোহে লিপ্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু এই মোহ চিরস্থায়ী শান্তি দিতে পারে না। মানুষের আধ্যাত্মিক যাত্রার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো জাগতিক অসারতা উপলব্ধি করা। যখন একজন ব্যক্তি বুঝতে পারে যে দুনিয়ার অঢেল ধন-সম্পদ, উচ্চ পদমর্যাদা, সকলের ভালোবাসা কিংবা পার্থিব কোনো প্রেমই তার হৃদয়ের গহীন তৃষ্ণা মেটাতে সক্ষম নয়, তখনই তার মাঝে প্রকৃত আধ্যাত্মিক আশ্রয়ের তীব্র ব্যাকুলতা তৈরি হয়। মানুষ তার জীবনে যতই সফল হোক না কেন, এক ধরনের অলক্ষ্য শূন্যতা তাকে সর্বদা তাড়া করে ফেরে। এই শূন্যতা মূলত তার আত্মার তৃষ্ণা, যা কেবল তার স্রষ্টার সান্নিধ্যেই পূর্ণ হতে পারে। পবিত্র কোরআনে এই মানসিক ও আত্মিক প্রশান্তির চাবিকাঠি হিসেবে ইরশাদ হয়েছে, 'আলা বিযিকরিল্লাহি তাত্বমায়িন্নুল কুলুব', অর্থাৎ 'জেনে রেখো, আল্লাহ্র জিকির বা স্মরণের মাধ্যমেই কেবল অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে' –(সূরা আর-রাদ : ২৮)। এই জিকির কেবল জিহ্বার উচ্চারণ নয়, বরং হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দনে স্রষ্টাকে অনুভব করা।

আধ্যাত্মিক অগ্রযাত্রার একটি অপরিহার্য অংশ হলো দুঃখ ও বিপদে হৃদয়ের পরিশুদ্ধি। সূরা আল-বাক্বারা-এর ১৫৫ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, "আর আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি এবং ফল-ফসলের বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও ধৈর্যশীলদের"। সুফিয়ায়ে কেরাম বিপদকে অভিশাপ হিসেবে নয়, বরং পরম প্রিয়তমের পক্ষ থেকে প্রেরিত উপহার বা পরীক্ষা হিসেবে দেখেন। অগ্নি যেমন স্বর্ণকে পুড়িয়ে তার খাদ দূর করে উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে, তেমনি দুঃখ-বেদনার অনল মানুষের নফ্স বা রিপুর কালিমা মুছে দিয়ে আত্মাকে বিশুদ্ধ করে তোলে। বিপদের এই পর্যায়টি মানুষকে তার নিজের অক্ষমতা ও মুখাপেক্ষিতা বুঝিয়ে দেয় এবং স্রষ্টার প্রতি নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের পথ প্রশস্ত করে। অলিকুল শিরোমণি হযরত গাউসুল আযম শায়খ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (ক.) তাঁর কালজয়ী গ্রন্থ 'ফুতুহুল গায়ব'-এ উল্লেখ করেছেন, 'মু'মিনের ওপর আপতিত মুসিবত হলো তার হৃদয়ের কপাট খোলার চাবিকাঠি'। যখন পৃথিবীর যাবতীয় বাহ্যিক দরজা মানুষের জন্য বন্ধ হয়ে যায়, তখনই বান্দা নিরুপায় হয়ে তার অন্তরকে রবের দিকে রুজু করে। এই নিরুপায় অবস্থায় করা প্রার্থনা স্রষ্টার আরশ পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং বান্দাকে স্রষ্টা মিলনের আকাঙ্ক্ষায় তীব্রভাবে উদ্বুদ্ধ করে। মাওলানা রুমি (র.) তাঁর মসনবী শরিফে লিখেছেন,

হর কে উ আয আস্লে খোদ্ দূর মান্দ,
বায জুয়াদ রূযগারে ওয়াস্লে খোদ্।
অর্থঃ যে ব্যক্তি তার আদি উৎস বা শিকড় থেকে দূরে পড়ে যায়, সে পুনরায় তার সেই মিলনের দিনগুলো বা সংযোগটি অনুসন্ধান করতে থাকে।

যখন বান্দা দুনিয়ার মায়া কাটিয়ে স্রষ্টার দিকে ধাবিত হওয়ার সংকল্প করে, তখন স্বয়ং স্রষ্টাও তার প্রতি অসীম মমতা নিয়ে এগিয়ে আসেন। হাদিসে কুদ্সিতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, "আমার বান্দা যখন আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই; সে যখন আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাই" (সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৭৪০৫)। এই ঐশী টানই একজন সাধারণ মানুষকে সাধারণের গণ্ডি ছাড়িয়ে আধ্যাত্মিক জগতের উচ্চতর সোপানে আরোহণের সাহস ও প্রেরণা জোগায়। প্রখ্যাত সুফি ও উর্দু কবি আল্লামা ইকবাল (র.) মানুষের এই আত্মিক জাগরণ ও প্রেমের তীব্রতাকে বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন:

তেরে ইশক্ কী ইন্তিহা চাহতা হুঁ
মেরি সাদগী দেখ কেয়া চাহতা হুঁ।
অর্থঃ আমি তোমার প্রেমের চূড়ান্ত সীমা বা শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছাতে চাই; আমার সরলতা দেখো যে আমি আসলে কী বিশাল আকাঙ্ক্ষা লালন করছি।

মানুষের হৃদয়ে আধ্যাত্মিক প্রেম উদয় হওয়ার আরেকটি কারণ হলো নিখুঁত সৌন্দর্য ও মহাপ্রতাপশালী ক্ষমতার প্রতি

আনুগত্যপূর্ণ আকর্ষণ। সৃষ্টির প্রতিটি অণু-পরমাণুতে স্রষ্টার নিপুণ কারুকার্য ও সৌন্দর্য বিদ্যমান। শায়খুল আকবর মহিউদ্দিন ইবনে আরাবী (র.) তাঁর 'ফুতুহাত-আল-মাক্কিয়া' গ্রন্থে বলেছেন যে, 'সমগ্র মহাবিশ্ব হলো মূলত আল্লাহ্‌র সৌন্দর্যের এক বিশাল দর্পণ'। যখন কোনো মানুষ অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে এই সৌন্দর্যের প্রকৃত কারিগরকে চিনতে পারে, তখন তার হৃদয়ে জাগতিক প্রেমের পরিবর্তে এক শাশ্বত ও প্রকৃত প্রেমের উদয় হয়। সে তখন রূপের আড়ালে অরূপের সন্ধান পায়। এই সৌন্দর্য দর্শনের ব্যাকুলতা ধীরে ধীরে সত্যসন্ধানী মানুষকে এতটাই আবিষ্ট করে যে, সে স্রষ্টা ছাড়া অন্য সব কিছু থেকে নিজেকে বিমুক্ত করে নেয়। মানুষের অবচেতন মন বা রূহ্ সর্বদা এই সত্যটি বহন করে যে, এই পৃথিবী তার চিরস্থায়ী আবাস নয়। বিশ্বাসী ও স্রষ্টানুসন্ধানীরা দুনিয়ার মুসাফিরখানায় বসে আখেরাত বা মিলনের প্রস্তুতি নিতে থাকে। সুফিগণ মৃত্যুকে দেখেন প্রিয়তমের সাথে মিলনের মহালগ্ন বা উরস হিসেবে। হযরত সুলতান বায়েজিদ বোস্তামী (র.) আধ্যাত্মিক প্রেরণার এক পর্যায়ে বলেন, আমি ত্রিশ বছর ধরে আল্লাহ্‌কে খুঁজছিলাম, কিন্তু যখন আমি পরিশেষে তাঁকে পেলাম, তখন অবাক হয়ে দেখলাম যে আসলে তিনিই আমাকে খুঁজছিলেন। অর্থাৎ বান্দার হৃদয়ে যে আল্লাহ্‌কে খোঁজার ব্যাকুলতা বা আধ্যাত্মিক প্রেরণা তৈরি হয়, তাও মূলত আল্লাহ্‌রই এক বিশেষ অনুগ্রহ। মানুষের এই রূহানি বা আধ্যাত্মিক পরিচয়টি যখন তার জাগতিক পরিচয়ের ওপর প্রাধান্য পায়, তখনই সে ইনসানে কামেল বা পরিপূর্ণ মানুষ হওয়ার পথে অগ্রসর হয়।

কিন্তু সৃষ্টিজগতে এমন মানুষও আছে, যারা হিংসা, অহংকার, লোভ-লালসা ও দুর্বিনীত আচরণ দ্বারা নিজের অন্তকরণকে এমনভাবে আবদ্ধ করে রেখেছে, যার ফলে স্রষ্টার পক্ষ হতে যেকোনো আহ্বানকে সে উড়িয়ে দেয়, আমিত্ব ও অহংকারে অন্ধ হয়ে অকৃতজ্ঞতার উপর সে দৃঢ় ও স্থায়ী হয়ে যায়। সূরা আল-বাক্বারাহ্-এর ৭ নং, সূরা আল-মুমিন-এর ৩৫ নং, সূরা আল-মুতাফ্‌ফিফিন-এর ১৪ নং, সূরা আত-তাওবাহ্-এর ৯৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে, "মানুষ যখন অহংকার, অবাধ্যতা এবং ক্রমাগত পাপাচারের মাধ্যমে সত্য জেনেও তা থেকে বিমুখ থাকে, তখন মহান আল্লাহ্ শাস্তিস্বরূপ তাদের অন্তরে সীলমোহর করে দেন, যার ফলে তাদের হৃদয়ে সত্য গ্রহণের স্বাভাবিক ক্ষমতা ও চেতনা চিরতরে হারিয়ে যায়"। হেদায়েতের দরজা বন্ধ হয়ে যায় তাদের জন্য এবং তারা নিজেদেরকে ইবলিশ বা শয়তানের সৈন্যদলে অন্তর্ভূক্ত করে। এর ফলস্বরূপ তারা আল্লাহ্‌র বন্ধু, মনোনীত প্রতিনিধিদের, হেদায়েতকারী এবং সত্য সন্ধানী ব্যক্তিদের সাথে নিজেদের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য দ্বারা শত্রুতা শুরু করে দেয়, যা তাদের ইহকাল ও পরকাল ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট।

ঐশীপ্রেমের এই দীর্ঘ ও বিপদসংকুল যাত্রার চূড়ান্ত পরিণতি হলো স্রষ্টাপ্রেমে স্থির থেকে তাঁরই অনুগ্রহে আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে নিজের ভেতর স্রষ্টার স্থায়ী অবস্থান প্রতিষ্ঠা করা। যখন একজন মানুষ তার অন্তরের সমস্ত কলুষতা, আমিত্ব এবং অহংকারের পর্দা সরিয়ে ফেলতে সক্ষম হন, তখন তার হৃদয় হয়ে ওঠে ঐশী নূরের স্বচ্ছ দর্পণ। মানুষের হৃদয় আল্লাহ্ তা'আলার এক অতুলনীয় ও রহস্যময় সৃষ্টি। সমগ্র মহাবিশ্ব যা ধারণ করতে পারে না, একজন প্রকৃত প্রেমিকের ক্ষুদ্র হৃদয় তা অনায়াসে ধারণ করতে সক্ষম। এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সুফি সাধক ও উর্দু ভাষার ধ্রুপদী কবি খাজা মীর দর্দ (র.) অত্যন্ত চমৎকারভাবে উল্লেখ করেছেন,

'আর্জ-ও-সামা কাঁহা তেরি উসআত কো পা সাকে,
মেরা হি দিল হ্যায় ওহ কে যাঁহা তু সামা সাকে'।

অর্থ: আসমান এবং জমিনের সাধ্য কোথায় যে তোমার বিশালতাকে ধারণ করবে? একমাত্র আমার হৃদয়ই হলো সেই পবিত্র স্থান যেখানে তুমি সম্পূর্ণভাবে সমাহিত হতে পারো।

আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত অল্প কয়েকজন বিশেষ ব্যক্তিত্ব ছাড়া কামেল মুর্শিদের প্রতি শর্তহীন আত্মসমর্পণ ব্যতীত আধ্যাত্মিক জগতের সকল বাঁধা পার করা একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব নয়। মানুষের প্রবৃত্তি বা নফ্‌স সব সময় তাকে দুনিয়াবি মোহ, কাম-ক্রোধ এবং অহংকারের দিকে টেনে নিতে চায়। এই অদৃশ্য ফাঁদগুলো থেকে মুক্ত হয়ে রবের দিকে একা একা এগিয়ে যাওয়া একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। কারণ যে পথ আগে কখনো পাড়ি দেওয়া হয়নি, সে পথে একজন অভিজ্ঞ গাইড ছাড়া চলতে গেলে পথ হারানোর ভয় থাকে। পবিত্র কোরআনে সূরা আল-কাহফের ১৭ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, "আল্লাহ্ যাকে পথ প্রদর্শন করেন, সে-ই সঠিক পথপ্রাপ্ত হয়। আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, তুমি কখনোই তার জন্য কোনো পথপ্রদর্শনকারী বন্ধু বা ওয়ালিইয়াম মুরশিদা পাবে না"। এই আয়াতের ওয়ালিইয়াম মুরশিদা শব্দটিই মূলত কামেল মুর্শিদের কোরআনিক ভিত্তি, যিনি একজন সালেক বা

সত্যসন্ধানীকে অজ্ঞানতার মোহাবর্ত থেকে বের করে ঐশী আলোর পথে নিয়ে আসেন। রাসূলুল্লাহ্ (দ.) ইরশাদ করেছেন, "মানুষ তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর ধর্ম বা রীতিনীতির অনুসারী হয়। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকের খেয়াল রাখা উচিত সে কার সাথে বন্ধুত্ব করছে" (সুনানে আবু দাউদ শরিফ, ৪৮৩৩)। আধ্যাত্মিকতার পথে মুর্শিদ হলেন সেই পরম বন্ধু এবং আধ্যাত্মিক পিতা, যাঁর আত্মিক সান্নিধ্যে শিষ্যের অন্তর সমস্ত পার্থিব কলুষতা থেকে মুক্ত হয়।

হযরত মাওলানা রুমি (র.) তাঁর 'মসনবী' শরিফে লিখেছেন,
পীর রা বেগোজিন কে বি পীর ইঁ সফর,
হাস্ত বাস পোর আফাত ও খৌফ ও খাতার।
অর্থ: একজন পীর বা পথপ্রদর্শক নির্বাচন করো, কারণ পীর ছাড়া এই আধ্যাত্মিক যাত্রা অসংখ্য বিপদ, ভয় এবং ঝুঁকিতে পরিপূর্ণ।

আল্লামা ইকবাল (র.) একজন কামেল মুমিন বা মুর্শিদের আধ্যাত্মিক দৃষ্টির অভাবনীয় শক্তি বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর বিখ্যাত 'বালে জিবরিল' কাব্যে লিখেছেন,
কোই আন্দাযা কার সাকতা হ্যায় উসকে যোরে বাজু কা,
নিগাহে মর্দে মুমিন সে বদল জাতি হ্যায় তাকদিরেঁ।
অর্থ: একজন কামেল মুমিন বা আধ্যাত্মিক মুর্শিদের অন্তর্নিহিত শক্তির অনুমান কে করতে পারে? তাঁর একটি গভীর আধ্যাত্মিক দৃষ্টিপাতেই মানুষের ভাগ্য ও অন্তরের অবস্থার পরিবর্তন হয়।

মুর্শিদ যখন খোদা প্রদত্ত শক্তির দ্বারা শিষ্যের আত্মাকে অবলোকন করে রুহানি ফয়েজ প্রদানের মাধ্যমে প্রস্তুত করেন, তখনই সেই আত্মা স্রষ্টার পরম প্রেম ধারণ করার যোগ্যতা অর্জন করে। কামেল মুর্শিদের নূরানি হাত ধরেই একজন সত্যসন্ধানী মানুষ তার পার্থিব খোলস ভেঙে ঐশীপ্রেমের অনন্ত সাগরে অবগাহন করার প্রকৃত দিশা খুঁজে পায়। যেমন, লোহা নিজে থেকে কখনো পরিষ্কার হতে পারে না, যতক্ষণ না একজন দক্ষ কর্মকার তাকে আগুনে পুড়িয়ে ও ঘষে মেজে চকচকে করে। তাই মাইজভাণ্ডারী দয়াধন্য গীতিকার ও আধ্যাত্মিক রহস্যধারী ব্যক্তিত্ব কবিয়াল রমেশ শীল যিনি রমেশ ফকির মাইজভাণ্ডারী নামে পরিচিত, আকুল হয়ে লিখেছেন–
রমেশ জাঙ্গারী লোহা, তুমি পরশমণি,
কদমে পরশ কর, নয় কর কোরবানি।

আধ্যাত্মিকতা মানে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া নয়, বরং স্রষ্টাকে ভালোবেসে তাঁর সৃষ্টিকে সেবা করা। যখন একজন সালেক বা খোদা পথচারী ব্যক্তি বিরহের অনলে পুড়ে স্রষ্টার মিলনে প্রশান্তি লাভ করেন, তখন তার পুরো সত্তা খোদার ঐশী রঙে রঙিন হয়ে ওঠে। এই স্তরে পৌঁছেই সে বুঝতে পারে যে মানবসৃষ্টির আদি উদ্দেশ্যই হলো এই ঐশীপ্রেমের পূর্ণতা, এই অপার্থিব ভালোবাসা। তাই মানুষের জীবনের সার্থকতা কেবল পার্থিব ভোগে নয়, বরং সেই আদি প্রেমের উৎসে ফিরে যাওয়ার নিরন্তর প্রচেষ্টায় নিহিত। এই প্রচেষ্টা মানুষের জীবনের জটিলতাকে দূর করে তাকে এক শান্তিময় ও অর্থবহ জীবনের সন্ধান দেয়, যেখানে ভয় বা দুশ্চিন্তার কোনো স্থান নেই। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, "জেনে রেখো, আল্লাহ্র বন্ধুদের (আউলিয়া) কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না" –(সূরা ইউনুস : ৬২)। যে অন্তরে স্রষ্টার প্রেম নেই, তা কেবলই একটি শূন্য পাত্র। আর যে অন্তর ঐশীপ্রেমে সিক্ত, তা পার্থিব জীবনের সীমানা পেরিয়ে অনন্তকালের জন্য অমরত্ব লাভ করে। স্রষ্টার প্রতি এই নিঃশর্ত ভালোবাসা এবং এর ফলে স্রষ্টার গুণে গুণান্বিত হয়ে তাঁর রং ধারণ করার সক্ষমতা মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীবের প্রকৃত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে। তাই মানবজীবনের সবচেয়ে বড় সার্থকতা হলো নিজেকে চেনা এবং তার মাধ্যমে পরম করুণাময়ের সন্তুষ্টি অর্জন করে আল্লাহ্ তা'আলার অনন্ত প্রেমে নিজেকে সমর্পণ করা। এই সমর্পণের মাধ্যমেই সমাপ্ত হয় বিচ্ছেদের হাহাকার, আর সূচিত হয় চিরন্তন মিলনের এক নতুন অধ্যায়।

(সমাপ্ত)

আল কোরআনের বাণী

"অতএব যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করেছে সে-ই সফল। আর যে নিজেকে কলুষিত করেছে সে-ই ব্যর্থ"
– (সূরা শামস : ৯-১০)।

বেলায়তের অবিনশ্বর আলোকধারা গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)

♦ শাহজাদা সৈয়দ ফয়জুল আবেদীন আরমান ফরহাদাবাদী ♦

ইসলামের প্রথম যুগে আধ্যাত্মিকতা শরীয়তের কঠোর অনুশাসন ও হুকুমতের শৃঙ্খলে (মোকাইয়্যাদা) আবদ্ধ ছিল। কিন্তু যুগের পরিবর্তনে, সময়ের আবর্তনে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয়ের প্রেক্ষাপটে শরীয়তের বাহ্যিক কাঠামো দুর্বল হয়ে পড়ে। এই সংকটকালে ধর্মের প্রাণশক্তি রক্ষার জন্য প্রথা ও রেওয়াজমুক্ত এক অসীম আধ্যাত্মিকতার (মোত্লাকা) প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। আধ্যাত্মিকতা স্থির কোন বিষয় নয়, এটি যুগের চাহিদা অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়ে মানুষের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে এবং স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির চিরন্তন সম্পর্কের সেতুবন্ধন তৈরি করে।

রাসুল (দ.)-এর পবিত্র উপস্থিতিতে বা ইসলামের প্রাথমিক যুগে শরীয়ত ও ত্বরিকত ছিল একীভূত। তখন আধ্যাত্মিকতা বা সুফিবাদ ছিল "সুন্নতে মোস্তফা (দ.)"-এর অবিচ্ছেদ্য অংশ। তখন আধ্যাত্মিক ফয়েজ বা নূর সরাসরি রাসুল (দ.)-এর সাহচর্যের শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল। সাহাবায়ে কেরাম সরাসরি সেই উৎস থেকে সিক্ত হতেন।

রাসুল (দ.)-এর ওফাতের পর যখন খিলাফত ব্যবস্থা পরবর্তীতে মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করে, তখন রাষ্ট্রীয় কাঠামোর প্রভাবে আধ্যাত্মিকতা কিছুটা আড়ালে চলে যায়। এই শূন্যতা পূরণে গাউসুল আযম হযরত শায়খ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (ক.) কাদেরীয়া ত্বরিকা প্রবর্তন করেন।

বড় পীর দস্তগীর (ক.)-এর সময় হতে প্রায় ৬০০ বৎসর দীর্ঘ সময়ের দূরত্বের দরুন এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সাথে যোগাযোগ ছিন্ন হওয়ায় ইসলামী ইমারতের পুনরায় ভাঙন ধরে এবং শরীয়তী ব্যবস্থাযুগে নৈতিক ধর্ম-প্রধান এক বেলায়তে মোত্লাকায়ে আহমদী যুগের আবশ্যকতা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এই যুগ খোদায়ী ইচ্ছা শক্তিকে অধিকতর প্রাধান্য দেয়, সেই বেলায়তের অধিকারী সুমহান ব্যক্তি হলেন গাউসুল আযম খাতেমুল অলদ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)। তিনি বেলায়তে মোকাইয়্যাদা যুগের খাতেম বা সমাপ্তকারী এবং বেলায়তে মোত্লাকা যুগের আরম্ভকারী, ধর্মসাম্য "তাওহিদে আদ্ইয়ান"-এর সমর্থক। যার প্রেক্ষিতে আল্লামা মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী (ক.) এই মহান ব্যক্তিত্বকে খাতেমুল অলদ বলে উল্লেখ করেছেন।

বেলায়তে মোকাইয়্যাদা যুগে শায়খগণ তাসাওউফকে নির্দিষ্ট ছক বা সিলসিলায় বিন্যস্ত করেন যাতে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত না হয়। এটি ছিল যুগের চাহিদা অনুযায়ী ইসলামের অভ্যন্তরীণ নূরকে (আত্মিক পবিত্রতা) রক্ষা করার একটি হেকমত। অন্যদিকে বেলায়তে মোত্লাকায়ে আহমদী যুগে নৈতিক ধর্মের উপর প্রাধান্য ইসলামের অভ্যন্তরীণ নূরকে রক্ষা করার একটি হেকমত হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ইসলামের শায়খগণ ধর্মের মৌলিক বৈশিষ্ট্য এবং আনুষ্ঠানিক পরিবর্তন করেন না, কিন্তু তাঁরা তাজদীদ করেন, কারণ যুগে যুগে মানুষের মনস্তাত্বিক অবস্থা পরিবর্তিত হয়।

বেলায়তে মোত্লাকা যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এটি বিভেদ সৃষ্টিকারী বাহ্যিক রূপের ঊর্ধ্বে উঠে সকল ধর্মের মূল আধ্যাত্মিক সত্যের মধ্যে ঐক্য বা সাম্য সমর্থন করে। বেলায়তে মোত্লাকা যুগের অলিগণ এমন এক পূর্ণতা লাভ করেন যা সাধারণ মানুষের সীমিত বুদ্ধি বা প্রচলিত শরীয়তের মাপকাঠিতে বিচার করা অসম্ভব। বিচারিক কঠোরতার ঊর্ধ্বে আল্লাহ্র রহমান গুণ যেমন অপরাধীকে মার্জনা করতে পারে, বেলায়তে মোত্লাকাও তেমনি বাহ্যিক রীতির ঊর্ধ্বে খোদায়ী রহমতের প্রাধান্য ঘোষণা করে। পবিত্র কোরআনে সূরা আদ দোহার চতুর্থ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে "তোমার শেষ প্রথম হতে উত্তম।" যা দীর্ঘ বেলায়ত যুগের সুসংবাদ।

যুগের প্রয়োজনে আল্লাহ্র মহান অলি-উল্লাহ্গণ স্রষ্টার কার্যাদি পালনের জন্য, স্রষ্টার নির্দেশে পৃথিবীতে আগমন করেন। গাউসুল আযম মাইভাণ্ডারী (ক.) বেলায়তে মোত্লাকা যুগের সূচনাকারী। বিভ্রান্তি নিরসনে, ঐশ্বরিক ইলহাম প্রাপ্ত আল্লাহ্র মহান অলি কুত্বে জামান হযরত সফি উল্লাহ্ (রহ.)-এর একটি ইলহামী উক্তি উপস্থাপন করছি যা তিনি গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) সম্পর্কে বলেছেন। তিনি গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) সম্পর্কে বলেন, "মিয়া চিন? কি চিন! ছয় শত বছরের মধ্যে এইরূপ অলি উল্লাহ্ পৃথিবীতে আসেন নাই! এটি হযরত কেবলার মরতবা সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ঘোষণা। এটি শুধু ঐশ্বরিক ইলহামপ্রাপ্ত উক্তি নয়, এটি তাসাওউফ জগতের এক মহাবিস্ফোরণ এবং আধ্যাত্মিক বিবর্তনের এক অমোঘ ঘোষণা। এই উক্তিতে "কি চিন"-এর অর্থ হলো সাধারণ মানুষের স্থূল চক্ষু বা শরিয়তের বাহ্যিক জ্ঞান দিয়ে এই মহান সত্তাকে পরিমাপ করা অসম্ভব। আর ছয়শ বছরের ব্যবধান সুফিতত্ত্বে একটি বিশেষ চক্র। গাউসুল আযম বড়পীর দস্তগীর (ক.) থেকে গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর পূর্ব সময়কালটি ছিল শৃঙ্খলিত আধ্যাত্মিকতার যুগ। এই বাণীর মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে দীর্ঘ বিরতির পর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর মাধ্যমে আধ্যাত্মিক সূর্য পুনরায় তার পূর্ণ তেজ নিয়ে উদিত হয়েছে। এই বাণীর মাধ্যমে বুঝা যায় হযরত কেবলার আধ্যাত্মিক অবস্থান ছয়শ বছরের মধ্যে অদ্বিতীয়। গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) বেলায়তে মোত্লাকা যুগের আধ্যাত্মিক প্রবাহকে উন্মুক্ত করেছেন এবং 'আহমদ উল্লাহ্' নামের রহস্য নিয়ে এসেছেন, যা আল্লাহ্র জাত বা মূল সত্তার সাথে সম্পর্কিত। গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) সাধারণ কোন পীর নন, তিনি যুগের শ্রেষ্ঠ মুজাদ্দিদ, বেলায়তে মোত্লাকার রাজাধিরাজ। সর্ববেষ্টনকারী ত্বরিকা মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার মহান প্রবর্তক এবং খাতেমুল আউলিয়া। হযরত আল্লামা মুহিউদ্দিন ইবনু আরাবি খাতেমুল আউলিয়ার বর্ণনা দিয়ে বলেন, তিনি বেলায়তের সমস্ত মোকাম বা মর্যাদার নিরীক্ষণকারী হন। তিনি রাসুল করিম (দ.)-এর রূপের মধ্যে একটি সর্বোত্তম রূপ।"

হযরত ইব্রাহিম (আ.)'র স্বপ্নঃ হযরত ইসমাঈল (আ.)'র কোরবানিঃ ইবনুয-যবীহায়েন হযরত মুহাম্মদ (দ.) এবং শোহাদায়ে কারবালার মর্যাদাপূর্ণ আত্মদান প্রসঙ্গ

◆ মুহাম্মদ আমিরুল ইসলাম রিয়াজ ◆

মর্যাদাপূর্ণ ইসলামের ইতিহাস আত্মত্যাগ, সত্যনিষ্ঠা ও মহান সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টির জন্য নিজেকে বিলীন করে দেওয়ার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ। আর এ মহান ত্যাগ ও মহিমার ভাস্বর ইতিহাসের দুই মহান অধ্যায় হলো পবিত্র কোরবানি এবং কারবালা। এদিকে হযরত ইবরাহিম (আ.)'র আনুগত্যের পরীক্ষা বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ (দ.)'র পিতা হযরত আবদুল্লাহ্‌র কোরবানি প্রসঙ্গ, অন্যদিকে মাওলা ইমাম হোসাইন (রা.)'র রক্তস্নাত শাহাদাত সবকিছুই ইসলামের চিরন্তন আদর্শকে মানবজাতির সামনে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে। বর্তমান নৈতিক অবক্ষয়ের যুগে এই শিক্ষা মানবজাতির সম্মুখে সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। পবিত্র কোরবানির সূচনা হয় হযরত ইবরাহিম (আ.)'র জীবনের এক অনন্য পরীক্ষার মাধ্যমে। মহান আল্লাহ্ তায়ালা স্বপ্নের মাধ্যমে তাঁকে তাঁর প্রিয় পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে কোরবানির নির্দেশ দেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন– "অতএব তাঁর পিতা-তাঁকে ডাকলেন, হে আমার প্রিয় পুত্র! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, তোমাকে কোরবানি দিতে হবে। এখন বলো, এ ব্যাপারে তোমার মত কী? ইসমাঈল জবাবে বললেন, হে আমার পিতা! আপনাকে যা নির্দেশ করা হয়েছে তা-ই করুন। আপনি আমাকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় ধৈর্যশীলদের একজন হিসেবেই পাবেন" –(সূরা আস-সাফ্‌ফাত : ১০২)। তখন থেকে হযরত ইসমাঈল (আ.)'র নামে উপাধি সংযুক্ত হয় 'যবী উল্লাহ্'। এ ঘটনা ইসলামে Obedience (আনুগত্য ও Submission (আত্মসমর্পণ)-এর সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত হিসেবে পরিচিত। মহান আল্লাহ্ তায়ালা কোরবানির স্থলে একটি দুম্বা পাঠিয়ে দেন এবং মানবজাতির জন্য কোরবানির বিধান চালু করেন। পরবর্তী সময়ে হযরত মুহাম্মদ (দ.)'র অভিপ্রায় এবং আল্লাহ্‌র হুকুমে কোরবানি ঈদুল-আযহা নামে মুসলিম উম্মাহ্‌র ধর্মীয় উৎসবে Institutionalized Religious Practice হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে পবিত্র কোরবানি নফ্‌স, অহংকার, লোভ ও আত্মকেন্দ্রিকতার কোরবানি। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে "কোরবানির মাংস বা রক্ত আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছায় না, আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছায় শুধু তোমাদের নিষ্ঠাপূর্ণ 'তাকওয়া'। এই লক্ষ্যেই কোরবানির পশুগুলোকে তোমাদের অধীন করে দেয়া হয়েছে। অতএব আল্লাহ্ তোমাদের সৎপথ প্রদর্শনের মাধ্যমে যে কল্যাণ দিয়েছে, সেজন্যে তোমরা আল্লাহ্‌র মহিমা ঘোষণা করো"– (সূরা হজ : ৩৭)। এতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, পবিত্র কোরবানির মূল লক্ষ্য হলো আত্মশুদ্ধি ও তাকওয়া অর্জন। এটি ইসলামের সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

পবিত্র কোরবানির আরেকজন উদাহরণ হচ্ছেন বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ (দ.)'র পিতা, হযরত আবদুল্লাহ্ (আ.)। হযরত আবদুল্লাহ্‌র জন্মের পূর্বে হুজুর (দ.)'র দাদা কাবা শরিফের সেবায়ত এবং কোরাইশ নেতা হযরত আবদুল মোত্তালিব পবিত্র যমযম কুপ পুনঃ খননকালে স্বীয় শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে আল্লাহ্‌র কাছে দশটি পুত্র সন্তান কামনা করে আর্জি পেশ করেন। এ সময় দশ পুত্র সন্তানের মধ্যে একজনকে আল্লাহ্‌র নামে কোরবানি প্রদানের অভিপ্রায়ও ব্যক্ত করেন। দশ পুত্র সন্তানের জন্ম এবং বেড়ে উঠার পর হযরত আবদুল মোত্তালিব একদিন কাবাগৃহের সামনে ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় ঐশী নির্দেশনামূলক এক স্বপ্ন দেখেন, "হে আবদুল মোত্তালিব! এ ঘরের মালিকের উদ্দেশ্যে তোমার মান্নত পূর্ণ করো।" স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে আবদুল মোত্তালিব তাঁর সকল পুত্র সন্তানকে ডেকে মান্নত এবং স্বপ্নের কথা তাদের অবহিত করেন। সকল ছেলে উপস্থিত হয়ে তাঁকে একবাক্যে একই অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, "আপনার মান্নত আপনি পূর্ণ করুন, যাকে ইচ্ছে হয় করুন।" আবদুল মোত্তালিব সরাসরি কোন সন্তানের নাম নির্দিষ্ট না করে প্রত্যেক ছেলের নামে লটারী করেন। লটারীতে কনিষ্ঠপুত্র এবং সর্বাধিক স্নেহধন্য অনন্য সুন্দর অবয়ব ও চেহারার অধিকারী হযরত

আবদুল্লাহ্’র নাম উঠে। যথারীতি হযরত আবদুল মোত্তালিব কোরবানির উদ্দেশ্যে হাতে ছুরিসহ আবদুল্লাহ্কে নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে যেতে থাকলে বোনদের মধ্যে কান্নাকাটি শুরু হয়। তখন এক বোন কোরবানির উদ্দেশ্যে হযরত আবদুল্লাহ্র পাশাপাশি দশটি উট কোরবানির উপর লটারী করার জন্যে পিতৃ সমীপে আর্জি পেশ করেন। প্রস্তাব করা হয় যদি দশটি উটের পক্ষে লটারী উঠে তা হলে উট কোরবানি দেয়াই সঙ্গত হবে। সে সময়ে হত্যার বিনিময়ে দিয়াত হিসেবে দশটি উট প্রদানের নিয়ম চালু ছিল।

উট লটারী করা হলেও আবদুল্লাহ্’র নামই উঠে। এদিকে আবদুল্লাহ্’র মামা এবং বোনেরা এ ব্যাপারে নাছোড়বান্দা ছিলেন। তাঁরা আরো অধিকবার দশটি করে উট কোরবানির উপর লটারী করার জন্যে আবদুল মোত্তালিবের প্রতি অনুরোধ জানায়। তখন বার বার দশটি করে উট কোরবানির বিষয় সংযুক্তির এক পর্যায়ে হযরত আবদুল্লাহ্’র পরিবর্তে একশ উট কোরবানির পক্ষে লটারী আসে। তখন সকলে সমস্বরে ‘আল্লাহু আকবর’ ধ্বনি দিয়ে মোবারক সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানান। স্বপ্নাদেশের আলোকে হযরত আবদুল মোত্তালিব সাফা মারওয়া পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে আবদুল্লাহ্’র পরিবর্তে একশ উট কোরবানি দিয়ে আল্লাহ্র সঙ্গে অঙ্গীকার বজায় রাখেন। তখন থেকে হযরত আবদুল্লাহ্ ‘আবদুল্লাহ্ যবীহ’ নামে সম্বোধিত হতে থাকেন। বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ (দ.)’র আবির্ভাবের পর তিনি ‘ইবনুয-যবীহায়েন’ তথা দু যবীহ’র সন্তান হিসেবে পরম অভিধায় সম্বোধিত হতে থাকেন। উল্লেখ্য, হযরত ইসমাঈল (আ.) হলেন বংশ লতিকা অনুযায়ী হযরত মুহাম্মদ (দ.)’র ঊর্ধ্বতন পিতৃপুরুষ। আর হযরত আবদুল্লাহ্ (আ.) হলেন হুজুর (দ.)’র সরাসরি ঔরস তথা পিতা। এদিক থেকে কোরবানির আধ্যাত্মিক সংযোগ অত্যন্ত সুগভীর আল্লাহ্র বারেগাহে সন্তুষ্টি অর্জনের অনন্য পাথেয়।

কোরবানির তাকওয়ার সর্বোচ্চ প্রতিফলন দেখা যায় কারবালার ময়দানে হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)’র শাহাদাত বরণে। আল্লাহ্র প্রিয় মাহবুব হযরত আহমদ মোজতবা মোহাম্মদ মোস্তফা (দ.)’র ওফাতের পর ইসলামি খিলাফতের ধারাবাহিকতা হযরত ইমাম হাসান (রা.)’র মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। শুরু হয় মুল্‌কিয়াত। মুসলিম মুল্‌কিয়াতের এক পর্যায়ে ক্ষমতাসীন হয় ইয়াজীদ। এ সময় ইসলামের মৌলিক আদর্শ উপেক্ষিত হয় এবং অনৈতিক শাসন ব্যবস্থা চালু হয়। সম্পূর্ণ প্রতিকূল পরিস্থিতিতে রাসুল (দ.)’র দৌহিত্র মাওলা ইমাম হোসাইন (রা.) অন্যায়ের সঙ্গে আপস করেননি। এক পর্যায়ে কুফার মুসলমানরা ইমাম মাওলা ইমাম হোসাইন (রা.)-কে অনেকগুলো চিঠি পাঠান যে তারা ইয়াজিদের শাসন মানতে রাজী নয়। তারা মাওলা ইমাম হোসাইনের হস্ত মোবারকে বাই‘আত গ্রহণ করবেন। জালেমের অনৈতিক শাসন এবং রোমান-পারস্য আদলের মুল্‌কিয়াত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে অবশেষে ৬১ হিজরী, ১০ মোহর্‌রম, ১০ অক্টোবর ৬৮০ খ্রিস্টাব্দে ইরাকের কারবালা নামক স্থানে মাওলা ইমাম হোসাইন (রা.) পরিবারের সদস্য সহ ৭২ জন সাথী নিয়ে শহিদ হন। এই কারবালা ইসলামের ইতিহাসে এক মর্মান্তিক বস্তুনিষ্ঠ কোরবানির অধ্যায়। এ কোরবানির প্রান্তরে শহীদগণ তৃষ্ণা, দুর্দিন এবং চরম অনিশ্চয়তার মাঝেও রবের প্রতি স্থিরতা, বিশ্বাস ও ধৈর্য হারাননি। কোরবানি ও কারবালা বাহ্যিকভাবে ভিন্ন প্রেক্ষাপটের মনে হলেও আত্মিক দিক থেকে উভয়ই অভিন্ন সূত্রে গাঁথা। বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত একমাত্র ত্বরিকা বিশ্বসমাদৃত ত্বরিকা -এ মাইজভাণ্ডারীয়ার দর্শনের মূল কথাই হলো নফ্‌সের কোরবানি, আত্মশুদ্ধি ও মানবপ্রেম জাগ্রত করা। এ দর্শনে কোরবানি মানেই হলো নিজের ভেতরের পশুত্বকে নিঃশেষ করা। আর কারবালা হলো সত্যের পক্ষে অনঢ় অবস্থান, ত্যাগি ও আদর্শবান নেতৃত্বে মানবিক সমাজ গঠন করা।

আল কোরআনের বাণী

“আল্লাহ্ পবিত্র কাবাঘরকে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের প্রতীক হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। একইভাবে পবিত্র মাস ও গলায় মালা পরানো কোরবানির পশুও আল্লাহ্ মানুষের কল্যাণের জন্যে নির্ধারণ করেছেন, যাতে তোমরা জানতে পারো যে, মহাকাশ ও পৃথিবীর সবকিছু সম্পর্কেই আল্লাহ্ অবহিত। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ”

– (সূরা মায়েদা : ৯৭)।

বাই'আতের আলোকে মুরিদ-মুর্শিদ সম্পর্ক

♦ উম্মে হাবিবা (তানিয়া) ♦

১. বাই'আত : বাই'আত ও মুরিদ-মুর্শিদের সম্পর্ক ইসলামের আধ্যাত্মিক সাধনা তথা তাসাওউফের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি, যার মূল ধারণা পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ্ থেকেই উৎসারিত। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: "যারা আপনার কাছে বাই'আত (অর্থাৎ আনুগত্য করার শপথ) করে আসলে তারা আল্লাহ্র কাছে বাই'আত করে। তাদের হাতের উপর আছে আল্লাহ্র হাত। এক্ষণে যে এ ওয়াদা ভঙ্গ করে, এ ওয়াদা ভঙ্গের কুফল তার নিজেরই উপর পড়বে। আর যে ওয়াদা পূর্ণ করবে যা সে আল্লাহ্র সঙ্গে করেছে, তিনি অচিরেই তাকে মহা পুরস্কার দান করবেন" –(সূরা আল-ফাতহ : ১০)। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কোরআনে আরও বলেন: "মু'মিনদের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হলেন যখন তারা (হুদাইবিয়ায়) গাছের তলে আপনার কাছে বাই'আত নিল। আল্লাহ্ জানতেন তাদের অন্তরে কী আছে, এজন্য তিনি তাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ করলেন আর পুরস্কার হিসেবে তাদেরকে দিলেন নিকট আসন্ন বিজয়" –(সূরা আল-ফাতহ : ১৮) এবং "হে নবি, যখন মু'মিন নারীরা আপনার কাছে এসে এই মর্মে বাই'আত করে যে, তারা আল্লাহ্র সাথে কোন কিছু শরিক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, তারা জেনে শুনে কোন অপবাদ রচনা করে রটাবে না এবং সৎকাজে তারা আপনার অবাধ্য হবে না। তখন আপনি তাদের বাইআত গ্রহণ করেন এবং তাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু" –(সূরা আল-মুমতাহিনা : ১২)। এসব আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, বাই'আত মূলত আল্লাহ্র পথে আনুগত্য, শৃঙ্খলা ও নৈতিক অঙ্গীকারের প্রতীক। ইসলামের আধ্যাত্মিক ধারায় এই বাই'আতের মাধ্যমে একজন সাধক বা অনুসারী (মুরিদ) একজন আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক (মুর্শিদ)-এর কাছে আত্মশুদ্ধি ও নফ্সের পরিশুদ্ধির জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। সুফি সাধকেরা মনে করেন, মুর্শিদের সোহবত ও নির্দেশনার মাধ্যমে মুরিদ ধীরে ধীরে তাযকিয়া-এ-নফ্স (আত্মশুদ্ধি), ইহ্সান এবং আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জনের পথে অগ্রসর হয়। তাই তাসাওউফের পরিভাষায় বাই'আত কেবল আনুষ্ঠানিক প্রতিজ্ঞা নয়; বরং এটি আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলা, নৈতিক জীবন গঠন এবং আল্লাহ্মুখী জীবনের একটি সুশৃঙ্খল পথের সূচনা।

২. মুরিদ : পীরের সাথে বাই'আতের মাধ্যমে কোন ব্যক্তি যখন সম্পৃক্ত হয়, তখন সেই ব্যক্তিকে মুরিদ বলে। মুরিদ হওয়া মানে ইচ্ছে শক্তিকে বিলীন করে দেয়া এবং বাই'আত হওয়া শব্দের অর্থ হলো বিক্রি হওয়া। অর্থাৎ শর্তহীনভাবে নিজের ইচ্ছা শক্তিকে পীরের ইচ্ছাশক্তির উপর অর্পণ করা বা বিসর্জন দেয়া। এ ক্ষেত্রে মুরিদের ব্যক্তিগত কোন ইচ্ছা, কামনা, বাসনা বলতে কিছুই থাকবে না। মুরিদ পীরের কাছে কাদা মাটির মত হয়ে যাবে। নরম কাদা মাটি দিয়ে কুমাররা যেমন তাদের ইচ্ছামতো জিনিসপত্র তৈরী করে তেমনি মুরিদ তার সকল ইচ্ছা বাসনা পরিত্যাগ করে পীরের ইচ্ছে বাসনা অনুযায়ী গড়ে উঠবে।

সাধারণত তিন শ্রেণির মুরিদ দেখা যায়। যেমন:

১. প্রথম শ্রেণির মুরিদ– যারা খোদা তালাশী।

২. দ্বিতীয় শ্রেণির মুরিদ– যারা দুনিয়া তালাশী, হাজত পূর্ণ করা তাদের উদ্দেশ্য।

৩. তৃতীয় শ্রেণির মুরিদ– তারা ধর্মীয় সামাজিকতা রক্ষায় মুরিদ হয় কিন্তু পীরের হুকুম পালনের ধার ধারে না প্রকারান্তরে সাধারণ মুরিদদেরকে প্রতারণা ও বিভ্রান্ত করে বেড়ায়। এমন মুরিদদের কাছ থেকে প্রত্যেকেরই সাবধান হয়ে চলা দরকার। এদের লক্ষ্যে মাওলানা আবদুল্লাহ্ শাহ্ বলেন–

'বে সরায় যে চলে ফিরে- গুরুজীর বদনাম করে,
জুতা মার তার ঘাড়ে- আদব কায়দা নাহি যার।'

প্রকৃত অন্তর হলো সে ব্যক্তির-যার অন্তরে পীরের প্রতি অগাধ ভক্তি-শ্রদ্বা রয়েছে এবং যার অন্তর ইশ্‌ক বা খোদাপ্রেমে জর্জরিত এবং তারাই সফলকাম। হলুদ ও চুন মিশালে যেমন তৃতীয় রং ধারণ করে তেমনি গুরু শিষ্য ইশ্‌ক এর দরিয়ায় মিশ্রিত হতে পারলে খোদার রঙ্গে রঞ্জিত হওয়া যায়।

৩. মুরিদ হতে হলে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে: ১. প্রকৃত আকাঙ্ক্ষা ২. পীরে কামেল বা পূর্ণগুরু প্রাপ্তি বলে স্বীকার বা বিশ্বাস ৩. পূর্ণ জ্ঞান বা বিদ্যার আগ্রহ ৪. পীরে দৃঢ় বিশ্বাস ও আকিদা ৫. পীরের প্রতি ভালোবাসা ৬. পীরের সাথে সদ্ব্যবহার ও আদব কায়দা ৭. নিজ আন্তরিক ঘটনা ও পীরের নিগুঢ় রহস্য গোপন রাখার শক্তি ৮. পীরের নিকটই একমাত্র সকল কিছু খুলে বলা।

৪. মুরিদের কর্তব্য: মুরিদের উচিত যে, পীরের আদেশ পাওয়া মাত্র ঠিক তাঁর আদিষ্ট কার্য সম্পন্ন করা এবং তাতে কখনও শৈথিল্য বা বিলম্ব না করা, নচেৎ মরদুদ বা শয়তান হবার সম্ভাবনা থাকে। নফল ইবাদত থাকলে, পীর কেবল ডাকামাত্র তাঁর নিকট উপস্থিত হতে হবে।

পীরের আদেশ নফল ইবাদত হতে উত্তম। পীর যখন কোন কাজ করতে আদেশ করে, মুরিদের উচিৎ তা যেন নিরাপদে পালন হয়। কারণ তাতে কোনো প্রকার গুপ্ত রহস্য লুকায়িত থাকতে পারে বা ভক্তের বিশ্বাস ভক্তি যাচাই বা পরীক্ষার জন্যও তা হতে পারে।

কোন প্রকার নেয়ামত অন্য কোন স্থান হতে প্রাপ্ত হলে তা নিজ পীর হতে জাহেরী বা বাতেনীতে প্রাপ্ত বলে মুরিদের জ্ঞান করা কর্তব্য। এ জন্য পীরের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্তব্য। মুরিদকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে কখনও যেন পীরকে পিঠ না দেয়। আবশ্যক হলে পিছপা হেঁটে যেন দৃষ্টির অন্তরালে চলে যায়। পীরের প্রতি মুরিদের আদবের অন্ত নেই। কিন্তু তা-ই প্রকৃত আদব যা মুরিদের দিল হতে উদয় হয়।

নিম্নলিখিত আদব মুরিদের থাকা উচিত:

১. এমন স্থানে হাঁটা বা দাঁড়ানো উচিত নয় যেন পীরের ছায়ার উপর ভক্তের পা পড়ে।
২. পীরের জায়নামাযে বা বিছানায় চলাফেরা না করা।
৩. পীরের ব্যবহার্য স্থান ব্যবহার না করা।
৪. পীরের সম্মুখে পানাহার না করা।
৫. পীরের সম্মুখে বিড়ি, সিগারেট বা হুক্কায় ধুমপান না করা বা নির্দিষ্ট পাত্রাদি ব্যবহার না করা।
৬. পীরের অবস্থানের দিকে, বাসস্থানে বা মাজার শরিফের দিকে পা লম্বিত না করা।
৭. পীরের দিকে থুথু না ফেলা বা প্রস্রাব না করা।
৮. পীরের সম্মুখে উচ্চস্বরে কথা বা বাহুল্য কথা না বলা।

৫. পবিত্র কোরআনে নারীদের বাই'আত: পবিত্র কোরআনে নারীদের বাই'আত বা আনুগত্য গ্রহণের বিষয়টি ইসলামের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক কাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। সূরা আল-মুমতাহিনা'র ১২নং আয়াতের পাশাপাশি কোরআনের অন্যান্য আয়াতেও ঈমানদার নারী-পুরুষের পারস্পরিক সহযোগিতা ও আনুগত্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী একে অপরের বন্ধু; তারা সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে" –(সূরা আত-তাওবা : ৭১)। এই আয়াত নির্দেশ করে যে নারীরাও দ্বীনের দায়িত্ব ও আনুগত্যের অঙ্গীকারে সমানভাবে অংশীদার। আবার আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "যে কেউ সৎকর্ম করে– পুরুষ হোক বা নারী এবং সে ঈমানদার হয়, তবে আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব" –(সূরা আন-নাহল : ৯৭)। এ থেকে বোঝা যায় যে ইসলামে নারী-পুরুষ উভয়েরই আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের প্রতি আনুগত্য ও অঙ্গীকার সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া আল-কোরআনে উল্লেখ আছে, "আল্লাহ্ মু'মিনদের নিকট থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন, এর বিনিময়ে তাদের জন্য জান্নাত" –(সূরা আত-তাওবা : ১১১)। এই আয়াতও মূলত বাই'আতের আত্মিক তাৎপর্যকে প্রকাশ করে, যেখানে মু'মিন নারী-পুরুষ সবাই আল্লাহ্র পথে নিজেদের সমর্পণ করে। সুতরাং আল-কোরআনের আলোকে নারীদের বাই'আত কেবল একটি আনুষ্ঠানিক অঙ্গীকার নয়; বরং এটি ঈমান, নৈতিকতা ও আল্লাহ্র পথে অবিচল থাকার এক গভীর আধ্যাত্মিক প্রতিশ্রুতি।

৬. রাসুলদের মধ্যে পার্থক্য নয়: পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, রাসুল (দ.) তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা তার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ঈমান এনেছে এবং মু'মিনগণও। তারা সবাই আল্লাহ্র উপর, তাঁর ফেরেশ্তাদের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর এবং রাসুলগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে, (তারা বলে), 'আমরা রাসুলগণের মধ্যে কারও ব্যাপারে তারতম্য করি না' এবং তারা এ কথাও বলে যে, 'আমরা শুনেছি এবং মেনে নিয়েছি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ক্ষমা করুন আর প্রত্যাবর্তন আপনারই দিকে" –(সূরা আল বাক্বারা : ২৮৫)।

যে ব্যক্তি যে পীরের মুরিদ অথবা যে অলিউল্লাহর ভক্ত তাকে অন্য পীর অলিদের চেয়ে উপযুক্ত ও বড় মনে করা ধর্মীয় মতে দূষণীয় নয়। তবে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে অন্য উপযুক্ত মর্যাদাবান পীর-অলিদের প্রতি অবজ্ঞা অসম্মান দেখানো উচিত নয়। তবু 'রিয়া' বা অহংকার বোধের কারণে শুধু ভক্ত-মুরিদ নয়, কোন কোন পীর-অলিদের বংশধর এবং তাঁদের নিকট আত্মীয়রা ও বিনা কারণে ভিন্ন ত্বরিকাপন্থী পীর-ফকিরদের প্রতি অবহেলা ও বেয়াদবি প্রদর্শন করে থাকেন। পীর-অলিদের মধ্যে মর্যাদাগত যে উঁচু-নীচু স্তর আছে তা ওইসব লোকেরা বুঝতে চায় না। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ধর্মীয় ও সামাজিক ঐক্য সংহতি এবং নিজেরাও। আসল না জেনে ধারণা প্রসূত বাড়াবাড়ি মূর্খতাই বটে। এই মূর্খতা ও অহংকার বোধের কারণে অন্য দরবারের কিছু ভক্ত, আওলাদ, মুরিদানের কিছু অংশ এবং

কিছুসংখ্যক আলেম শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারীকে এড়িয়ে চলতেন। তবু তিনি বিভিন্নভাবে তাদের ভুল সংশোধনে প্রয়াসী ছিলেন। চট্টগ্রামস্থ আন্দরকিল্লা রাজাপুকুর লেন নিবাসী শেখ বজলুর রহমান সাহেবের বাসায় সাপ্তাহিক মাইজভাণ্ডারী জিকিরে সামা মাহ্ফিল অনুষ্ঠিত হতো। মাহফিলে বিশিষ্ট মাইজভাণ্ডারী আশেক ভক্তদের সমাবেশ হতো। সেদিন বাবাভাণ্ডারীর দৌহিত্র আজিমনগর দরবারের সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম প্রকাশ গায়েবী ধন মিঞার মুরিদ মৌলবী আফজল, হালিশহরের টুনু চৌধুরী, চান্দগাঁর নুরুল হুদা চৌধুরী, সৈয়দ মোহাম্মদ ইউসুফ প্রকাশ টুনু কাওয়ালসহ বহু লোক উপস্থিত ছিলেন। মৌলবী আফজল সুন্দর সুরে মিলাদ পড়তেন। একই বাসায় শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী অবস্থান করলেও অন্যের মুরিদ হওয়ায় অথবা অন্য কোন কারণে মৌলবী সাহেব শাহানশাহ্ হুজুরকে এড়িয়ে চলতেন।

মাহ্ফিল শেষে আমরা খোশ আলাপ করছিলাম। হঠাৎ দরজা খুলে শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী সবার সামনে এসে জলদগম্ভীর সূরে পাঠ করলেন পবিত্র কোরআনের এ আয়াত, "লা নুফার্‌রিকু বাইনা আহাদিম্ মির্‌রাসুলিহি" অর্থাৎ– 'আল্লাহ্‌র রাসুলদের মধ্যে আমরা কোন পার্থক্য করি না' –(সূরা বাক্বারা : ২৮৫)। আয়াতটি পাঠ করেই তিনি নিজ কক্ষের দরোজা পুনঃ বন্ধ করে দিলেন। আল্লাহ্‌র নবি রাসুলদের মধ্যে কোন ভিন্নতা নেই। সবাই এক তাওহিদ ও এক রেসালাতের জিম্মাদার প্রচারক প্রকাশক। (উৎস: শাহনশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.), মাসিক আলোকধারা, সেপ্টেম্বর-১৯৯৮)

৭. ফজিলতে রব্বানী: হযরত আদম (আ.) যেইরূপ "আল্লামা আদামাল আছমা'য়া কুল্লাহা" –(সূরা বাক্বারা : ৩১)। অর্থাৎ "আল্লাহ্ আদম (আ.)-কে তাঁহার সমস্ত নামাবলির জ্ঞানদান করিয়াছেন" এবং আল্লাহ্‌র খলিফা নিযুক্ত করিয়াছেন; তদ্রুপ যুগে যুগে সমস্ত গুপ্ত-ব্যক্ত খোদায়ী জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিও খোদার খলিফা এবং পবিত্র রাসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নায়েব বা প্রতিনিধি। মাওলানা রুমী মসনবিতে বলেন– "প্রত্যেক দাওরা বা বৃত্তে জগতের আবর্তন বিবর্তনের যুগে একজন অলীয়ে কামেল বিদ্যমান থাকিবেন; যাহার পরীক্ষা নিরীক্ষা কেয়ামত পর্যন্ত জারি থাকিবে। প্রকৃত প্রস্তাবে সেই ব্যক্তিই রাসুলুল্লাহর নায়েব বা প্রতিনিধি, যেই ব্যক্তির দিলের মধ্যে খোদার হুকুম নাজেল বা অবতীর্ণ হয়।

এই ফজিলতে রব্বানীর বর্ণনা দিতে গিয়ে মাওলানা রুমী মছনবিতে যাহা বলেন– "মানব যখন খোদায়ী জ্যোতিঃ আহরণকারী হয়, তখন সেই ব্যক্তি ফেরেস্তাদের ছজিদা গ্রহণকারী সাব্যস্ত হয়। ঐ ব্যক্তিগণও তাঁহাকে ছজিদা করে; যাহারা ফেরেশ্‌তার মত হইয়াছে। অর্থাৎ যাহারা হেকারত, হিংসা, অবাধ্য প্রকৃতি ও সন্দেহ প্রবৃত্তি হইতে মুক্ত" –(উৎস: বেলায়তে মোত্‌লাকা, পৃষ্ঠা: ৮৮)।

৮. ইসলামী তাসাওউফের মূল স্রোতধারায় বাই'আত কোনো আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং আল্লাহ্‌র সঙ্গে গভীর অঙ্গীকারের এক মহান মাধ্যম যা আল-কোরআন ও সুন্নাহ্‌র সুস্পষ্ট নির্দেশনা থেকে উৎসারিত। মুরিদ-মুর্শিদের সম্পর্ক এই পথে আত্মশুদ্ধি, নফ্‌সের পরিশুদ্ধি, ইহ্‌সান ও আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের এক অপরিহার্য সেতু। প্রকৃত মুরিদদের জন্য পীরের প্রতি অগাধ ভালোবাসা, পূর্ণ আনুগত্য, আদব-একাগ্রতা ও নির্ভরতা অত্যাবশ্যক, যা কেবল বাহ্যিক আচরণে নয়, অন্তরের গভীরে প্রোথিত থাকতে হবে। শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর জীবন ও শিক্ষা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, রাসুলগণের মধ্যে যেমন কোনো পার্থক্য করা যায় না, তেমনি আউলিয়া-এ কেরামের মধ্যেও অহংকার বা অবজ্ঞার পরিবর্তে পরস্পরের মর্যাদা স্বীকার করে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের চর্চা করা উচিত। শেষ পর্যন্ত, এই আধ্যাত্মিক যাত্রার লক্ষ্য একটিই– আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন ও তাঁর রঙে রঞ্জিত হওয়া। যে মুরিদ এই পথে অটল থেকে নিজেকে সমর্পণ করে, সে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে সফলতা ও ফজিলতে রব্বানীর অধিকারী হয়। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে সেই পথে অবিচল রাখুন এবং প্রকৃত মুর্শিদের সোহবতে তাঁর নৈকট্য লাভের তাওফিক দান করুন। আমীন।

তথ্যসূত্র:

১. আল-কোরআন
২. বেলায়তে মোত্‌লাকা, লেখক: খাদেমুল ফোক্বারা ছৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী, প্রকাশকাল: ১৯৭৪ ইং
৩. শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সির্‌রাহুল আজিজ), লেখক: জামাল আহমদ সিকদার, প্রকাশকাল: ১৯৮২ খ্রি.
৪. আত্মশুদ্ধি, লেখক: নূরুল ইসলাম ভূঞা, প্রকাশকাল: ২০১৬ খ্রি.

আল কোরআনের বাণী

"নিশ্চয়ই যারা তোমার রবের সান্নিধ্যে রয়েছে তারা কখনো অহংকারে ইবাদত বিমুখ হয় না। তারা সব সময় আল্লাহ্‌র মহিমা ঘোষণা করে এবং তাঁকেই সেজদা করে"

–(সূরা আরাফ : ২০৬)।

তাযকেরাতুল আউলিয়া'র লেখক সুফি কবি ফরিদ উদ্দিন আত্তার (রহ.)

♦ মোঃ আকিব ♦

১. পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তায়ালা ঘোষণা দিয়েছেন, "আর তোমার রব যখন ফেরেশ্তাদেরকে বললেন, আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে যাচ্ছি" –(সূরা আল বাক্বারা : ৩০)। এ প্রসঙ্গে আত্তার বলেন, "হৃদয়ের গভীর থেকে মহান আল্লাহ্র প্রশংসা জ্ঞাপন করছি, যিনি মানুষকে খেলাফত বা প্রতিনিধিত্ব দান করেছেন।" আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, "অঙ্গীকার পূর্ণ করো। নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে" –(সূরা বনী ইসরাঈল : ৩৪)। এ সম্পর্কে আত্তার বলেন, "ওহে তুমি কোনো কিছু না বলেই অঙ্গীকার পূর্ণ করো। কেননা তুমি স্বীয় প্রতিজ্ঞা থেকে বিপথগামী হয়ে গিয়েছো।" আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, "কস্মিনকালেও কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যদি তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে তোমরা ব্যয় না করো। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে আল্লাহ্ তা জানেন" –(সূরা আলে ইমরান : ৯২)। এ বিষয়ে আত্তার বলেন, "চতুর্দিকে যা কিছু আছে সবই দান করে দাও, যতক্ষণ দান না করবে ততক্ষণ কল্যাণ পাবে না।" আল্লাহ্ তায়ালার বাণী, "কখনো না, নিশ্চয় সৎলোকের আমলনামা আছে ইল্লিয়্যিনে" –(সূরা মুতাফফিফিন : ১৮)। এ সম্পর্কে আত্তার বলেন, "জান্নাতের পুষ্পকানন এই সৎলোকদের জন্য নয় কি? কেননা নিশ্চিতভাবে ইল্লিয়্যিন সৎলোকদের আবাসস্থল।" আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, "তিনিই প্রথম, তিনিই সর্বশেষ, তিনিই প্রকাশমান ও অপ্রকাশমান এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত" –(সূরা আল হাদিদ : ৩)। এ বিষয়ে আত্তার বলেন, "তিনি অদৃশ্য এবং দৃশ্যমান সত্তার অধিকারী, অর্থাৎ প্রথম এবং সর্বশেষ সবই তিনি।" আল কোরআনের ঘোষণার সঙ্গে কবি আত্তারের চিন্তার এ যেন অবিকল সঙ্গতি।

ফারসি সাহিত্যের একজন মহান সুফি কবি ফরিদ উদ্দিন আত্তার। তাঁর কবিতায় আধ্যাত্মিক চিন্তা-দর্শন, নিষ্ঠা, সততা ও সরলতার মাধ্যমে ফুটে উঠেছে। এ ছাড়া তাঁর কাব্যের অন্তর্নিহিত মর্মবাণী সানায়ির কাব্যের চেয়ে ব্যাপক ও বিস্তৃত। তাঁর কাব্যের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো সবগুলো কাব্যগ্রন্থ সুফিবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত। এমনকি তাঁর কাব্যে একটি পঙক্তিও পাওয়া দুষ্কর; যাতে আধ্যাত্মিকতার রঙ বর্জিত হয়েছে। সাহিত্যকর্মের সব অস্তিত্বকে তিনি তাসাওউফ তাসাওউফ বা সুফিবাদের জন্য উৎসর্গ করেন। মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমির সুফিবাদ আত্তারের সুফিবাদের সঙ্গে একই সূত্রে গাঁথা। আত্তারের সুফিবাদ প্রেম-ভালোবাসার ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে ছন্দ ও সুরের মূর্ছনায় উন্নততর স্তরে উপনীত হয়ছে। এই তিনজনের কাব্য তাঁদের প্রত্যেকের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। পরবর্তীকালে অন্যান্য সুফিকবি এশ্‌কে এলাহির প্রকৃত রূপ বৈচিত্র্যময় কাব্যশৈলী ও বাচনভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন। তাঁদের কাসিদা, গজল, মসনবি, রুবাঈ, তারজিবান্দ ও তারকিববান্দ কাব্যে আধ্যাত্মিক চিন্তাদর্শন প্রাণবন্তরূপে বিধৃত হয়েছে।

২. হযরত শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার (রহ.)-এর প্রকৃত নাম মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইব্রাহিম। তাঁর ডাক নাম ফরিদ উদ্দিন। তাঁর কবিতা লিখার অভ্যাস ছিল। সেক্ষেত্রে তিনি নিজ ছদ্মনাম "আত্তার" ব্যবহার করতেন। এক সময় আতরের ব্যবসা করতেন বলে মুসলিম জাহানে তিনি "ফরিদ উদ্দিন আত্তার" নামে পরিচিত। তাঁর কুনিয়াত (উপনাম) ছিল আবু হামিদ, আবু তালিব প্রভৃতি। মধ্য এশিয়ার নিশাপুর তাঁর জন্মস্থান। তাঁর পবিত্র মাজারও সেখানে। তাঁর জন্ম তারিখ নিয়ে কিছুটা মতভেদ দেখা যায়। তবে অধিকাংশের মতে ৬ শাবান ৫১৩ হিজরি সন মোতাবেক ১১১৯ খ্রিস্টাব্দে পারস্যের খোরাসান প্রদেশের নিশাপুরের কাদকানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সাঈদ নাফিসির মতে, তিনি ৫৩৭ হিজরি মোতাবেক ১১৪৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন–(Arberry, ১৯৫৮:১২৯)। ফরিদ উদ্দিন আত্তারের পিতার নাম 'ইব্রাহিম', কুনিয়াত 'আবু বকর'। তার পিতা একজন আল্লাহ্ প্রেমিক, আধ্যাত্মিক সাধক এবং ওষুধ বিক্রেতা হিসেবে খ্যাত ছিলেন। তার মাতা ছিলেন একজন ধর্মপরায়ণ নারী, যিনি প্রায় বিশ বছর আধ্যাত্মিক সাধনায় অতিবাহিত করেন–(শাজিঈ, ১৯৯৪:১)। পিতামাতার সান্নিধ্যের ফলে শৈশবকাল থেকেই আত্তারের মাঝে আধ্যাত্মিক গুণের সমাহার ঘটে; যা পরবর্তীকালে তাকে একজন মহান সুফিকবি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করতে অনুপ্রাণিত করে। তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন এবং যেভাবে তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল, তাতে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে কোন মতানৈক্য

নেই। এক তাতারী ঘাতকের হাতে তিনি শাহাদত বরণ করেন।

৩. শৈশব থেকে কৈশোর ও যৌবনের কিছু কাল তাঁর ইলম শিক্ষায় অতিবাহিত হয়। ফরিদ উদ্দিন আত্তার নিশাপুরে জন্মগ্রহণ করলেও মাশহাদের বাযাভিতে তাঁর শৈশবকাল অতিবাহিত হয়। নিশাপুরে অনেক কবি-সাহিত্যিক এবং ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব বসবাস করতেন। তিনি তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জনের পন্থা শিক্ষা লাভ করেন। তিনি তাফসির, হাদিস, ফিকহ ও উসুলে ফিকহ বিষয়ে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁর কাব্যে জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, দর্শন, ইসলামি ঐতিহ্য এবং কাব্যশিল্পের সূক্ষ্ম বিষয়গুলো অতি সুনিপুণভাবে চিত্রিত হয়েছে। তাঁর মসনবি কাব্যগ্রন্থগুলোর ভূমিকা ও উপসংহারে কুরআন, হাদিস, নবি-রাসুলগণের কাহিনী এবং ইসলামি ঐতিহ্যের প্রভাব অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। তিনি ইসলামি জ্ঞানের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেন।

আত্তার বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জনের লক্ষ্যে কঠোর পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করেন। তিনি খোরাসানের প্রখ্যাত মুহাদ্দিসের কাছ থেকে হাদিস শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন এবং হাদিস বর্ণনা করার অনুমতিও লাভ করেন। তাঁর দৃষ্টিতে ইলমে তাফসির, ইলমে হাদিস ও ইলমে ফিকহের জ্ঞান মানুষকে পৃথিবীতে শান্তি এবং পরকালে মুক্তি দিতে পারে। তাঁর কাব্যে এই তিন প্রকার ইলমের প্রভাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে আত্তার নিজেই বলেন,

علم دین فقه است و تفسیر و حدیث

هرکه خواند غیر این گردد خبیث

این سه علم پاک را مغز نجات

حسن اخلاقست و تبدیل صفات

این سه علمست اصل و این سه منبع است

هرچه بگذشتی ازین لاینفع است

(আত্তার, ১৯৯৫:৫৪-৫)

অর্থাৎ ধর্মীয় জ্ঞানের বিষয় হলো তাফসির, হাদিস ও ফিকহ/ এগুলো উপেক্ষা করে অন্য বিষয়ে জ্ঞানার্জন খাঁটি নয়।/ এই তিনটি পবিত্র জ্ঞান হচ্ছে নাজাত বা মুক্তির মূল/ তা উত্তম চরিত্র এবং নৈতিক গুণাবলির শিক্ষা দেয়।/ এ তিনটি জ্ঞান হচ্ছে মৌলিক এবং মূল উৎস/ এ তিন প্রকার জ্ঞান ব্যতীত সবই অনর্থক।

ফরিদ উদ্দিন আত্তার যাদের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে প্রভূত জ্ঞানার্জন করেন তারা হলেন শেখ নাজাম উদ্দিন কোবরা, মাজাদ উদ্দিন বাগদাদি, সাদ উদ্দিন আবুল ফাযল ইবনুর রাবিব ও কুতুব উদ্দিন হায়দার প্রমুখ।

৪. ফরিদ উদ্দিন আত্তার ছিলেন কর্মচঞ্চল, কঠোর পরিশ্রমী ও আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ একজন কবিপুরুষ। পিতার ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতেন। আত্তার পৈতৃক সূত্রে অনেক ধনসম্পদের মালিক ছিলেন। আর্থিক দিক থেকে তিনি অপরের মুখাপেক্ষী ছিলেন না। তিনি রোগীদের চিকিৎসার সাথে সাথে বিভিন্ন রকম আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতাও করতেন। তাই অনেকে তাঁকে চিকিৎসক এবং অনেকে তাকে ওষুধ বিক্রেতা হিসেবে আখ্যায়িত করেন–(নাফিসি, ১৯৪১:৫১)। প্রতিদিন তাঁর কাছ থেকে চিকিৎসাসেবা নেয়ার জন্য প্রায় পাঁচশত লোকের আগমন ঘটত। তিনি চিকিৎসা পেশার পাশাপাশি অবসরকালীন সময়ে আধ্যাত্মিক সাধনায় নিমগ্ন থাকতেন। এ কাজে সহযোগিতার জন্য তাঁর কিছুসংখ্যক ছাত্র নিয়োজিত ছিল। তিনি অভাবগ্রস্ত মানুষকে আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতা করতেন। এলাহি নামা কাব্যগ্রন্থে আত্তার বলেন,

بحمد الله كه در دین بالغم من

به دنیا از همه کس فارغم من

هر آن چیزی که باید بیش ازآن هست

چرا یازم به سوی این و آن دست

(ফোরুযানফার, ১৯৯৫: ৬৫)

অর্থাৎ সব প্রশংসা মহান আল্লাহ্‌র, আমি দ্বীনের উঁচু স্তরে উপনীত/ পৃথিবীর সবকিছু থেকে আমি অমুখাপেক্ষী।/ যা কিছু প্রয়োজন, এর চেয়ে অধিক রয়েছে আমার/ তারপরও কেন ডানে-বামে হাত বাড়াব।

ফরিদ উদ্দিন আত্তার কর্মজীবনের শুরুতে ওষুধের ব্যবসা করতেন। একদিনকার ঘটনা, তিনি নিজের দোকানে ক্রয়-বিক্রয় কাজে রত। এমনি সময় এক মুসাফির এসে তাঁর কাছে

ভিক্ষার জন্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু কোনরূপ সাড়া না পাওয়ায় মুসাফির অপেক্ষাকৃত উচ্চৈঃস্বরে ভিক্ষার দাবী জানায়। ফরিদ উদ্দিন তখন এত কর্মব্যস্ত ছিলেন যে, ভিক্ষা প্রদান করা তো দূরের কথা তিনি ভিক্ষুককে কিছু বলে বিদায় দেবারও সুযোগ পেলেন না। মুসাফির লোকটি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে নিরাশ হয়ে বলে উঠে, তুচ্ছ দুনিয়ার সামান্য অর্থ খরচ করতে তুমি এমন অনিচ্ছুক, না জানি প্রাণোৎসর্গ করার ব্যাপারে তুমি কিরূপ কর! মুসাফিরের কথা শুনে ফরিদ উদ্দিন বিরক্ত হয়ে বললেন, তা' তুমি যেমন করবে, আমিও তেমনই করব, দেখো। জবাব শুনে মুসাফির বলল, আচ্ছা আমি যেরূপ করি, তুমিও সেরূপ করবে তো? এই কথা বলে সে নিজের কাঁধের ঝুলিটি মাথার নীচে রেখে জমিনের উপরে শুয়ে কালেমা তাইয়্যেবা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" বার বার উচ্চারণ করতে শুরু করে দিল। এভাবে কলেমা পাঠ করতে করতেই তার দেহ খাঁচা হতে রূহ বের হয়ে গেল। এ আকস্মিক ঘটনায় ফরিদ উদ্দিনের অন্তরে এমনই ভাবান্তর ঘটে যায় যে, তিনি উক্ত মুসাফিরের কাফন-দাফন সবকিছু নিজেই সমাধা করে নিজের বিরাট ওষুধের কারবার এবং তৎসংশ্লিষ্ট সকল বিষয়বস্তু মানুষকে বিলি-বণ্টন করে নিজে মুসাফিরের বেশ ধারণ করলেন। অতঃপর খ্যাতনামা বুযুর্গ হযরত রুকনুদ্দীন আফাক (রহ.)-এর দরবারে গিয়ে তাঁর কাছ থেকে ইল্‌মে মারেফাতের জ্ঞান হাসিল করলেন। অতঃপর হজের উদ্দেশ্যে মক্কা মোয়ায্‌যমায় গমন করে হজ কার্য সমাধা করে তথাকার বহু মুর্শিদ ও মাশায়েখের সান্নিধ্যে থেকে ইল্‌মে ত্বরিকতের শিক্ষায় নিয়োজিত থাকেন। অবশেষে হযরত শেখ মাজদুদ্দীন বাগদাদী (রহ.)-এর দরবারে গিয়ে তাঁর কাছে থেকে ইল্‌মে মারেফাতের দীক্ষা গ্রহণ করলেন। এই সুযোগ্য উস্তাদের কাছে বেশ কিছু দিন অবস্থান করে তিনি মারেফাতের শীর্ষ পর্যায়ে উন্নীত হয়ে অচিরেই স্বীয় মুর্শিদগণের গৌরবের কারণ এবং ত্বরিকত-মারেফাতের গভীর তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী রূপে জগজ্জোড়া খ্যাতি লাভে সক্ষম হলেন।

হযরত শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার (রহ.)-এর শাহাদাতের ঘটনা সম্পর্কে জানা যায়, তাতারী দস্যুরা যখন নিশাপুরে হামলা চালিয়ে তথায় লুণ্ঠন ও হত্যাযজ্ঞ শুরু করে তখন তিনি সেখানেই অবস্থান করছিলেন। একজন জালিম তাতারী দস্যু তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হলে একব্যক্তি দস্যুকে দেখে বলে উঠে, এই বুযুর্গ দরবেশকে হত্যা না করে তুমি তার বদলে আমার থেকে দশ হাজার মোহর গ্রহণ কর। এই ব্যক্তির কথা শুনে ফরিদ উদ্দিন (রহ.) বললেন, আমাকে মাত্র দশ হাজার মোহরের বিনিময়ে বিক্রয় করো না। আমার মূল্য যে এর চেয়ে আরও বেশি। দস্যু আরও বেশি অর্থ পাওয়ার লোভে তাকে নিয়ে রওয়ানা হল। কিছু দূর যাওয়ার পরে আর একজন ব্যক্তি তাকে এভাবে বন্দী অবস্থায় দেখে দস্যুকে বলল, তুমি হযরতকে হত্যা না করে আমার কাছে দাও। বিনিময়ে তোমাকে আমি একটি খড়ের বোঝা প্রদান করছি। এবার ফরিদ উদ্দিন (রহ.) বললেন, হ্যাঁ তাহা তাকে দাও। তবে আমার মূল্য যে তাহা অপেক্ষা কম। দস্যু তাঁর কথা শুনে ভাবল যে, তিনি তার সাথে তামাসা করছেন। ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে সে তখনই অস্ত্রাঘাতে তাঁকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলে। গবেষকদের সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য অভিমত হচ্ছে, আত্তার ১২৩০ খ্রিস্টাব্দে শাহাদাত বরণ করেন। বিশ্ব বিখ্যাত সুফি কবি আল্লামা হযরত জালালুদ্দীন রুমি (রহ.) বিভিন্ন সময়ে হযরত ফরিদ উদ্দিন আত্তার (রহ.)-কে স্বীয় ইমাম এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে স্বরচিত জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ মাসনাভি মানাভি-তে তাঁর প্রতি অফুরন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করেছেন। তাছাড়া ঐ গ্রন্থে তিনি হযরত শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার (রহ.) রচিত একটি কবিতাও সন্নিবেশ করেছেন।

৫. মাওলানা নেজামী বলেন, হযরত জালালুদ্দিন রুমি বর্ণনা করেছেন যে, হযরত শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার (রহ.)-এর উপরে দেড়শত বছর পর আল্লাহ্ তায়ালা স্বীয় নূর অবতীর্ণ এবং ফায়েজ বর্ষণ করেন। খ্যাতনামা পারসিক কবি আল্লামা আবদুর রহমান জামি বলেন, শেখ ফরিদ উদ্দিনের কাব্যে যেরূপ ওয়াহ্‌দানিয়াতের মাহাত্ম্য এবং মারেফাতের গভীর রহস্যের সন্ধান পাওয়া যায় অন্য কোন সুফি কবির কবিতায় তদ্রূপ পাওয়া যায় না। কোন কোন গবেষক বলেন যে, তাঁর রচিত মোট পদ্য ও গদ্যের সংখ্যা কোরআনে পাকের সূরার সম সংখ্যক একশত চৌদ্দটি। তাছাড়া তদ রচিত গ্রন্থের সংখ্যাও হল মোট একশত চৌদ্দখানা। কাজী নূরুল্লাহ শোচতরী (রহ.)-ও স্বরচিত গ্রন্থ মাজালেসুল মু'মিনীনে এ বিষয়ে একই মত ব্যক্ত করেছেন। তবে তাঁর উক্ত গ্রন্থসমূহের মধ্যে নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহ বর্তমানে সমধিক উল্লেখযোগ্য। যথা:--(১) তাযকেরাতুল আউলিয়া, (২) মানতিকুত তায়ির, (৩) মুসিবত নামা, (৪) আসরার নামা, (৫) তাইসির নামা, (৬) ইলাহী নামা, (৭) পান্দে নামা, (৮) অসিয়ত, (৯) দিওয়ান, (১০) শারহুল কলব, (১১) খুশরু গোল।

হযরত শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার (রহ.) রচিত গ্রন্থগুলোর ধারণাতীত জনপ্রিয়তা দেখে বহু গ্রন্থকার নিজেদের রচিত গ্রন্থ অধিক বিক্রির জন্য গ্রন্থে নিজেদের নামের স্থলে শেখ ফরিদ উদ্দিন (রহ.)-এর নাম আগে ব্যবহার করেছেন। এই ধরনের নকল নামের গ্রন্থের মধ্যে লিসানুল হাকীকতও একখানা যা লন্ডনস্থ বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।

৬. শেখ আত্তার (রহ.) রচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে তাযকেরাতুল আউলিয়ার ভূমিকা রচনার মধ্য দিয়ে লেখকের চারিত্রিক গুণাবলি বিশেষতঃ বিনয়-নম্রতা ও দৈন্যতার বাস্তব রূপ ফুটে উঠেছে। তিনি নিজেকে সর্বাপেক্ষা দীনহীন এবং নিকৃষ্টতম বলে মনে করতেন। যতদূর মনে হয় এ কারণেই তাঁর নাম আজও আরিফ এবং খোদা-প্রেমিকদিগের হৃদয়ে অঙ্কিত হয়ে রয়েছে।

৭. শেখ ফরিদ উদ্দিন (রহ.) রচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে মানতিকুত তায়ির নামক কিতাবের বিষয়বস্তু ও ভাব প্রকাশের রীতি নব ধরনের। তিনি সর্বপ্রথম আল্লাহ্ ও রাসূল (দ.)-এর প্রশংসা এবং গুণ কীর্তনের পর খোলাফায়ে রাশেদীনের সুখ্যাতির বর্ণনা করে আসল বক্তব্য তিনি শুরু করেছেন নিম্নোক্ত রূপক ধারণা দিয়ে। তাঁর কাহিনীর নায়কগণকে কল্পনা করা হয়েছে পাখীরূপে; যথা– হুদহুদ, তোতা, মোরগ, কবুতর, শানা, বুলবুল, বাজ প্রভৃতি। কাহিনীর অবতারণা করেছেন তিনি কল্পচিত্র দিয়ে এভাবে। উল্লিখিত পাখীগুলো একদা এক সভায় মিলিত হয়ে তাদের মধ্যে কোন একজনকে বাদশাহ নির্বাচন করার সংকল্প করল। হুদহুদ পাখী এ পদের জন্য সী মোরগ পাখীর নাম প্রস্তাব করল। কিন্তু অন্যান্য পাখীগণ এতে আপত্তি করে বসল। হুদহুদ পাখী তাদের সবার আপত্তির কারণগুলো ধীর-স্থিরভাবে শুনে সবার কারণই খণ্ডন করল। অবশেষে সকলেই এক বাক্যে হুদহুদের প্রস্তাব সমর্থন করে সী মোরগ পাখীকেই নিজেদের অধিপতি বলে স্বীকার করে নিতে রাজী হল। তারপর তার কার্যধারা সম্পর্কিত বিষয়গুলো যা সাধারণতঃ ত্বরিকত পন্থীদিগের মনে জাগরূক হয়ে থাকে গ্রন্থকার তা' প্রশ্নোত্তরের রীতিতে এ গ্রন্থে সন্নিবেশ করেছেন। তিনি গ্রন্থখানার নাম "মানতিকুত তায়ির" পবিত্র কোরআনে সূরা নামল থেকে গ্রহণ করেছেন।

হুদহুদ পাখী বুদ্ধিমত্তায় পাখীকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিবেচনায় হযরত সোলায়মান (আ.) তাকে খুব আদর করতেন এবং ভালোবাসতেন। পক্ষান্তরে হযরত শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার (রহ.)-ও তাঁর কাহিনীর পাখীর নায়কদের হুদহুদ রূপ বিচক্ষণ সালেকের মুখ দিয়ে প্রকাশ করেছেন।

হযরত শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার (রহ.) কেবল কাব্য সাহিত্যেই যশস্বী ছিলেন না। তৎকালে তিনি কবিতার ন্যায় পদ্য রচনায়ও অদ্বিতীয় ছিলেন। কোন কোন লোক তাঁর আকীদা সম্পর্কে কিছুটা দ্বিমত পোষণ করেন। এটা যে নিছক হিংসা এবং বিদ্বেষ প্রসূত তাতে কোন সন্দেহ নেই। খোলাফায়ে রাশেদার উপরে তাঁর প্রবল আস্থা এবং শ্রদ্ধা প্রকাশ, তাছাড়া তাঁর রচিত গ্রন্থাবলিই তাঁর প্রতি বিদ্বেষীদের কটাক্ষপাতের সমুচিত জবাব বলে মনে করি।

৮. ফরিদ উদ্দিন আত্তার অন্যান্য সুফি সাধকের মতো জীবনের একটি বড় অংশ পৃথিবীর পরিভ্রমণে অতিবাহিত করেন। তিনি মক্কা সফর করার সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি খাওয়ারিজমে সফরকালে মাজদ উদ্দিন বাগদাদির সান্নিধ্যে উপস্থিত হন। তা ছাড়া আরো অনেক সুফি সাধকের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। তিনি মক্কা, মিসর, ইরাক, তুরস্ক, সিরিয়া এবং মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্থান পরিভ্রমণের পর অবশেষে স্বীয় মাতৃভূমি নিশাপুরে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। এ প্রসঙ্গে The New Encyclopaedia Britannica তে বলা হয়েছেঃ

"As a young man Farid od-Din traveled widely, visiting Egypt, Syria, Arabia, India, and central Asia. He finally settled in his native town, Nishapur, in northeastern Persia, where he spent many years collecting the verses and sayings of famous Sufis (Muslim mystics)." (The Encyclopaedia Britannica, 1768:685)

ফরিদ উদ্দিন আত্তার পৃথিবী পরিভ্রমণকে উপভোগ করতেন, এতে তিনি কখনো ক্লান্তি বোধ করতেন না। পরিভ্রমণের এই সঞ্চিত অভিজ্ঞতা তাঁর সাহিত্যকর্মে বিস্তৃত আকারে বর্ণিত হয়েছে। আসরার নামা কাব্যগ্রন্থটি রচনার আগে তিনি পবিত্র মক্কা পরিভ্রমণের সৌভাগ্য অর্জন করেননি। তাই তিনি আসরার নামা কাব্যগ্রন্থে রাসূলে আকরাম (দ.)-এর রওজা শরিফ জিয়ারতের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন এভাবেঃ

منم در فرقت آن روضه ی پاک
که بر سر میکنم از آرزو خاک

(আত্তার নিশাবুরি, ১৯৬০:৪৬)
অর্থাৎ ‘রওজা পাকের বিরহে কষ্ট অনুভব করছি আমি/ মাথায় ধারণ করব আমি সেই প্রত্যাশিত মাটি।’

৯. শৈশবকাল থেকেই সুফিবাদের প্রতি আত্তারের গভীর অনুরাগ ছিল। পিতার ওষুধ বিক্রির পেশায় নিয়োজিত থাকাকালীন তাঁর মধ্যে আধ্যাত্মিক প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। তিনি শেখ নাজম উদ্দিন কোবরা, মাজদ উদ্দিন বাগদাদি, সাদ উদ্দিন আবুল ফাজল ইবনুর রাবিব ও কুতুব উদ্দিন হায়দারের কাছে আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ করেন। তিনি জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ আধ্যাত্মিক গুরুদের সান্নিধ্যে অতিবাহিত করেন। এমনকি তিনি উজবেকিস্তান থেকে মক্কা পর্যন্ত পরিভ্রমণের সময় অনেক আধ্যাত্মিক সাধকের সাক্ষাৎ লাভ করেন। চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত অবস্থায়ই তিনি আধ্যাত্মিক রহস্য সংবলিত কাব্যগ্রন্থগুলো রচনা করেন। গ্রন্থগুলোতে তার আধ্যাত্মিক জগতে পদার্পণ সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের বর্ণনা রয়েছে। এটা প্রমাণিত যে, আত্তার তার মায়ের কাছ থেকেই আধ্যাত্মিকতার প্রতি অনুরাগী হওয়ার শিক্ষা অর্জন করেন। আব্দুর রহমান জামির মতে, কারো কারো দৃষ্টিতে আত্তার আভিসি ছিলেন। সুফি পরিভাষায় ‘আভিসি’ বলতে এমন আধ্যাত্মিক সাধককে বুঝায় যার মধ্যে বাহ্যিকভাবে পীর হবার কোনো নিদর্শন পরিলক্ষিত হয় না। তিনি আত্মিকভাবে হযরত রাসূলে আকরাম (দ.) অথবা অন্য কোনো বিজ্ঞ শেখ বা মুর্শিদের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করে থাকেন। তিনি আত্মিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে নিজে আধ্যাত্মিক পথ-পরিক্রমাগুলো অতিক্রম করেন এবং অন্যদেরকেও এ পথে পরিচালিত করেন। কেননা ‘আভিস’ কখনো সরাসরি রাসূল (দ.)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেন না বরং রূহানি বা আত্মিকভাবে তাঁর কাছ থেকে নূরের তাজাল্লি লাভ করে থাকেন। জামির আগে আরো অনেক গবেষক মনে করেন, আত্তার বাহ্যিকভাবে কোনো আধ্যাত্মিক গুরুকে অনুসরণ করে কাব্য রচনা করেননি। বরং স্বীয় আত্মিক অবস্থা তুলে ধরে কাসিদা রচনা করতেন। এতে হৃদয়ের গভীর অনুভূতি ও আধ্যাত্মিক পথ-পরিক্রমা অতিক্রমের পন্থাগুলো আলোচিত হয়েছে। এসব কাসিদা রচনায় আত্তার সুফিকবি আবু সাঈদ আবুল খায়েরের কাছ থেকে আত্মিক প্রেরণা লাভ করতেন। যেমন আত্তার নিজেই বলেন,

از دم بو سعید میدانم
دولتی کاین زمان همی یابم
از مددهای او بهر نفسی
دولتی ناگهان همی یابم
دل خود را از نور سینهٔ او
گنج این خاکدان همی یابم
تا که بی خویش گشته ام من ازو
خویش صاحب قرآن همی یابم

(আত্তার নিশাবুরি, ১৯৬২:৭৯২)
অর্থাৎ ‘আবু সাঈদের নিঃশ্বাস থেকে আমি জানি এই যুগে মহামূল্যবান সম্পদ আমি লাভ করি।/তার সাহায্য-সহযোগিতার দ্বারা প্রতিটি নিঃশ্বাসে অপ্রত্যাশিত সম্পদরাজি প্রতিনিয়ত লাভ করি আমি।/ স্বীয় হৃদয়কে তার বক্ষের নূরের তাজাল্লি দ্বারা এই মাটির দেহে সব রত্নভাণ্ডার লাভ করি।/ এমনকি তাকে ছাড়া আমি অস্তিত্বহীন স্বীয় সৌভাগ্য সবই অর্জন করি আমি।’

আত্তারকে যারা আভিসিদের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন তারা এসব কবিতাকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেন। কেননা তিনি অন্য কোনো আধ্যাত্মিক ব্যক্তি সম্পর্কে এতটা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটাননি, যতটা আবু সাঈদ আবুল খায়েরের ব্যাপারে প্রকাশ করেছেন। কাজেই আত্তার যদি আভিসি হয়ে থাকেন তাহলে নিঃসন্দেহে তিনি আবু সাঈদ আবুল খায়েরের কাছ থেকেই রূহানি বা আত্মিক শক্তি অর্জন করেছেন। আত্তারের সাহিত্যকর্ম বিশ্লেষণে প্রমাণিত হয় যে, আবু সাঈদ আবুল খায়েরের প্রতি তার গভীর আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধা ছিল। আত্তারের মুসিবত নামা কাব্যগ্রন্থে ৯টি হেকায়াত, ইলাহি নামাতে ৫টি হেকায়াত, মানতিকুত তায়িরে ৩টি হেকায়াত এবং আসরার নামাতে ১টি হেকায়াত শুধু আবু সাঈদ আবুল খায়ের সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে- (ফোরূযানফার, ১৯৯৫:৩২-৩৩)।– (চলবে)

আয়না-এ-হিন্দ আঁখি সিরাজ (রহ.)-এর জীবন ও কর্ম

♦ মিনহাজুল আলম ♦

মুহাম্মদ ঘুরীর ঐতিহাসিক ২য় তরাঈন যুদ্ধ (১১৯২ খ্রি.) জয়ের মাধ্যমে ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের সূত্রপাত ঘটে। যদিও তরবারি দ্বারা মুহাম্মদ ঘুরী যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন। কিন্তু ভারতবাসীর হৃদয় জয় করেছেন সুফিয়ায়ে কেরাম। যখন কোনো অঞ্চল বিদেশিদের আক্রমণে পদানত হয় তখন অধিকৃত অঞ্চলের জনগণ শাসকগোষ্ঠীর প্রতি বিরূপ ধারণা পোষণ করে। দিল্লি সালতানাতের প্রতিষ্ঠালগ্নে সেই বিরূপ মনোভাব প্রধানত প্রশমিত হয় মুসলিমদের মধ্যে থাকা বিশেষ জনগোষ্ঠী তথা সুফিদের দ্বারা। বিশেষত চিশ্‌তিয়া ত্বরিকার সুফিয়ায়ে কেরামের আচার-আচরণ ভারতবাসীকে বিমোহিত করেছে। ভারতীয় উপমহাদেশে চিশ্‌তিয়া ত্বরিকা যাত্রা শুরু করে হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ মঈনুদ্দিন চিশ্‌তি আজমিরী (রহ.)'র মাধ্যমে। এরপর ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের আনাচে-কানাচে চিশ্‌তিয়া ত্বরিকা বিস্তৃত হতে থাকে। সুফিদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে, তা হলো– এক স্থানে স্থির না থেকে ভ্রমণ করা; যাকে আধ্যাত্মিক পরিভাষায় সায়ের বলে। তেমনি সায়ের করে বাংলায় চিশ্‌তিয়া ত্বরিকার প্রেমসুধা প্রচারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন চিশ্‌তিয়া ত্বরিকার মাশায়েখগণ। যার ফলশ্রুতিতে মেহবুব-ই-ইলাহী হযরত খাজা শেখ সৈয়দ নিজামুদ্দিন আউলিয়া (রহ.)'র নির্দেশক্রমে তাঁর খলিফা হযরত শায়খ আঁখি সিরাজ উদ্দিন উসমান (রহ.) সর্বপ্রথম চিশ্‌তিয়া ত্বরিকার প্রেমসুধা নিয়ে বাংলায় আসেন। সিরাজউদ্দীন উসমান (১২৫৮-১৩৫৭), যিনি আঁখি সিরাজ নামে পরিচিত, তিনি ছিলেন ১৩-১৪শ শতকের একজন প্রখ্যাত বাঙালি সুফি সাধক এবং ইসলামি পণ্ডিত। তিনি চিশ্‌তিয়া ত্বরিকার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং দিল্লির খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়ার প্রধান শিষ্যদের একজন। আঁখি সিরাজকে "আয়না-এ-হিন্দ" (ভারতের দর্পণ) উপাধি দেওয়া হয়েছিল, যা তার জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতাকে নির্দেশ করে। তাঁর মাজার পশ্চিমবঙ্গের গৌড়ে অবস্থিত এবং এটি আজও হাজারো ভক্তকে আকর্ষণ করে। তৎকালীন বাংলায় হযরত আঁখি সিরাজ (রহ.) খানকাহ্ স্থাপনের মাধ্যমে সর্বপ্রথম চিশ্‌তিয়া ত্বরিকার আধ্যাত্মিক দীক্ষা দান শুরু করেছিলেন। তাঁর কার্যক্রম বাংলার সুফিবাদ চর্চার ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। তাঁর বিশেষ ভূমিকার ফলে সমগ্র বাংলায় চিশ্‌তিয়া ত্বরিকা ছড়িয়ে পড়ে। হযরত আঁখি সিরাজ (রহ.) বাংলার প্রথম চিশ্‌তিয়া ত্বরিকার সুফি হিসেবে ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করতে সমর্থ হয়েছেন।

জন্মপরিচয় ও প্রাথমিক জীবন : শায়খ আঁখি সিরাজ (রহ.) ১২৫৮ খ্রি./৬৫৬ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। শায়খ আঁখি সিরাজের প্রকৃত নাম উসমান এবং উপনাম সিরাজউদ্দীন। এছাড়া, তাঁর পীরে ত্বরিকত হযরত খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়া আঁখি এবং "আয়না-এ-হিন্দ" (ভারতের দর্পণ)১ উপাধি দিয়েছিলেন। তবে তিনি ভক্ত-অনুরক্তদের নিকট আঁখি সিরাজ নামে পরিচিত।

আঁখি সিরাজের জন্মস্থান নিয়ে ইতিহাসবিদদের মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কতিপয় ইতিহাসবিদ মনে করেন তিনি অযোধ্যায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাই আঁখি সিরাজের নামের শেষে আউধী লিখেন। ড. এনামুল হকের মতে আঁখি সিরাজ বাদায়ূনে জন্মগ্রহণ করেছেন তাই বাদায়ূনী উপাধিতে ভূষিত করেন।২ উপরোক্ত এই দুইটি মত ছাড়াও আরেকটি মত পাওয়া যায়। শায়খ আবদুল হক দেহলভী তাঁর আখবার-উল-আখইয়ার গ্রন্থে আঁখি সিরাজ গৌড়ী হিসেবে উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ, আঁখি সিরাজের জন্মস্থান বাংলার গৌড় অঞ্চলে।৩

শিক্ষাজীবন : শায়খ আঁখি সিরাজ (রহ.) মাত্র ১৪ বছর বয়সে মায়ের অনুমতিক্রমে দিল্লি গিয়েছিলেন পড়াশোনার উদ্দেশ্যে। তাঁর বয়স সম্পর্কে মুফ্‌তি আবদুল খবির সিয়ারুল আউলিয়া গ্রন্থের সূত্রে উল্লেখ করে বলেন– তাঁর শিক্ষাজীবন সূচনা বয়স ছিল ১৪ এবং তখনো তাঁর মুখে দাড়ি-গোঁফ গজায়নি।৪

দিল্লি পৌঁছেই তিনি মাশায়েখে-কেরামের খেদমতে নিজেকে নিয়োজিত করেন। তিনি শুধু মাকে দেখার বাসনা ছাড়া সম্পূর্ণ দুনিয়া বিমুখ করে নিজেকে মুর্শিদের কদমে সোপর্দ করেন। তাঁর খেদমতের একপর্যায়ে হযরত শেখ নিজামুদ্দিন আউলিয়া (রহ.) চিশ্‌তিয়া ত্বরিকা প্রসারের দায়িত্ব দিয়ে বিভিন্ন শিষ্যকে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। সেই তালিকায় শায়খ আঁখি সিরাজের নামও অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তীতে হযরত শেখ নিজামুদ্দিন আউলিয়া (রহ.) সেই তালিকায় আঁখি

সিরাজের নাম দেখে মন্তব্য করেন, "খেলাফতের প্রথম শর্ত– জ্ঞানের পূর্ণতা। আঁখি সিরাজের জ্ঞানের স্তরে কিছুটা কমতি রয়েছে। অজ্ঞ পীর শয়তানের খেলনা স্বরূপ" ।৫

সেই বিশেষ মজলিসে হযরত শেখ নিজামুদ্দিন আউলিয়া তাঁর দরবারের বিশিষ্ট পণ্ডিত মওলানা ফখর-উদ-দীন জারদারি (ইন্তিকাল ১৩২৭)-কে কিছুটা গর্বের সাথে আঁখি সিরাজের প্রশংসা করে শিক্ষা দেওয়ার নির্দেশ দেন। শিক্ষার প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহ এবং অধ্যবসায়ের ফলে তিনি দ্রুত একজন পণ্ডিতে পরিণত হন। মাত্র ৬ মাসে মওলানা ফখর-উদ-দীন জারদারির নিকট তিনি পড়াশোনা সমাপ্ত করেন। যখন তিনি পড়াশোনা সমাপ্ত করেন তখন হযরত শেখ নিজামুদ্দিন আউলিয়া তাঁকে সুফি খিরকা ও চাদর পড়িয়ে দেন এবং বাংলায় ত্বরিকা প্রচার-প্রসারের নির্দেশ দেন।৬

এছাড়া, আঁখি সিরাজ মাওলানা রুকন-দীন-এর কাছ থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি সেখানে কাফিয়ায়ে মুফাস্সাল (কবিতা ও বাক্য গঠনের উচ্চতর নাহু), মুখতাসার আল-কুদুরি (ফিকহ বিষয়ক গ্রন্থ) এবং মাজমা-উল-বাহরাইন (ফিকহ ও কালাম সংমিশ্রিত গ্রন্থ) প্রভৃতি কিতাব অধ্যয়ন করেছিলেন। আমির খুরদ (নিজামুদ্দিন আউলিয়ার শিষ্য এবং জীবনীকার এবং সেই সাথে সিয়ার-উল-আউলিয়ার লেখকও) তাঁর শিক্ষাজীবনে সহপাঠী ছিলেন। আঁখি সিরাজ (রহ.) অল্প সময়ের মধ্যে লেখাপড়া সম্পন্ন করেছেন এবং পণ্ডিত হয়ে স্বয়ং নিজে পাঠদানের উপযোগী হয়ে ওঠেন। পরবর্তী সময়ে শায়খের কাছেও শিক্ষার্থীর আগমন ঘটতে থাকে।

দিল্লি থেকে বাংলায় প্রত্যাবর্তন : আনুষ্ঠানিক খিলাফত লাভ করার পরও আঁখি সিরাজ দিল্লিতে থেকে যান। এসময় তিনি জ্ঞানার্জনের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং নিজ মুর্শিদ নিজামুদ্দিন আউলিয়ার সোহবতে থেকে সুফিবাদ সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। তবে, তিনি প্রতি বছর বাংলায় যেতেন তাঁর মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে, যা তাঁর পরিবার প্রীতি এবং শিকড়ের প্রতি ভালোবাসার নিদর্শন। ১৩২৫ সালে তাঁর মুর্শিদ খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়া ইন্তিকাল করেন। তৎপরবর্তীতে আঁখি সিরাজ আরও তিন বছর দিল্লিতে অবস্থান করেছিলেন। ঐ সময় দিল্লিবাসীকে শাস্তি দেওয়ার লক্ষ্যে অথবা খামখেয়ালী সিদ্ধান্তের ফল হিসেবে সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক রাজধানী দিল্লি থেকে দৌলতাবাদে স্থানান্তর করেন। তখন দিল্লিতে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে শায়খ আঁখি সিরাজ (রহ.) বাংলায় ফিরে আসেন এবং খানকাহ্ স্থাপন করেন।

আয়নায়ে হিন্দুস্তান আঁখি সিরাজ (রহ.)'র অবদান :

১. খানকাহ্ প্রতিষ্ঠা : বাংলায় অবস্থানকালে লখনৌতির সাদুল্লাপুরে আঁখি সিরাজ বাংলা অঞ্চলের প্রথম চিশ্তিয়া খানকাহ্ প্রতিষ্ঠা করেন যা শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক কেন্দ্রই নয়, সামাজিক সাহায্যেরও একটি স্থান ছিল। অল্প কিছুদিনের মধ্যে এ অঞ্চলের ধর্মীয় প্রচার-প্রসারের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয় এটি। এখানে সমাজহিতৈষী সকল প্রকার কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো। হিন্দু-মুসলিম সকলের তরে নিবেদিত ছিল তাঁর খানকাহ্।৭

২. লঙ্গরখানা চালু : আঁখি সিরাজ (রহ.) বাংলায় থিতু হওয়ার পর গরীব ও দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের জন্য লঙ্গরখানা চালু করেন। সুফিদের লঙ্গরখানা একটি বৈষম্যহীন সমাজ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা রাখতো। তাঁর স্থাপিত খানকাহ্ ব্যাপক ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও মানবিকতার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর লঙ্গরখানায় অভুক্ত, ভিখারী ও দরিদ্রদের জন্য সর্বদা খাদ্য প্রস্তুত থাকতো।

৩. সুফি পাঠাগার প্রতিষ্ঠা : শায়খ আঁখি সিরাজ (রহ.) দিল্লি থেকে বাংলায় প্রত্যাবর্তনের সময় তাঁর মুর্শিদ শেখ নিজামুদ্দিন আউলিয়ার গ্রন্থাগার থেকে কিছু বই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। আর এসব সংগ্রহশালা নিয়ে বাংলায় সর্বপ্রথম প্রাতিষ্ঠানিক সুফি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।৮

৪. গ্রন্থ প্রণয়ন : শায়খ আঁখি সিরাজ (রহ.) আরবি ব্যাকরণগ্রন্থ হেদায়াতুন্নাহু, মীজানুস সরফ, পাঞ্জগঞ্জ সহ বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন যা আধুনিক মাদ্‌রাসা কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করে পড়ানো হয়।

বাংলায় চিশ্তিয়া ত্বরিকার প্রচার-প্রসারে ভূমিকা :

বাংলায় সুফিদের ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, বাংলা ভূখণ্ডের সুফিদের অধিকাংশই চিশ্তিয়া ত্বরিকা দ্বারা প্রভাবিত। কেননা বাংলায় প্রচারিত ত্বরিকাসমূহের মধ্যে চিশ্তিয়া ত্বরিকাই ছিল সবচেয়ে সংগঠিত এবং প্রভাব বিস্তারকারী। বাঙালি সুফিদের অধিকাংশ চিশ্তিয়া ত্বরিকার সাধক ছিলেন যার মূল বীজ রোপণ করেছিলেন আঁখি সিরাজ (রহ.)। কেননা বাংলায় চিশ্তিয়া ধারার প্রথম

প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন শায়খ আঁখি সিরাজ উদ্দীন উসমান (রহ.)। দিল্লির আধ্যাত্মিক কেন্দ্র থেকে বাংলার প্রান্তিক অঞ্চলে চিশ্‌তিয়া ত্বরিকা পৌঁছে দেওয়ার জন্য এক ঐতিহাসিক ভূমিকা রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন শায়খ আঁখি সিরাজ (রহ.)। তাঁর কর্মপ্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে বাংলায় সূচনা ঘটে চিশ্‌তিয়া সুফি আন্দোলন।

জীবনাবসান : ৭৫৮হিজরি/১৩৫৭ সালে আঁখি সিরাজ (রহ.) লখনৌতিতে ইন্তিকাল করেছিলেন। তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী, তাঁর পীরের কাছ থেকে পাওয়া খিরকাসমেত সাগর দীঘির উত্তর-পশ্চিম কোণে সমাহিত করা হয়। বর্তমানে তাঁর সমাধি হাজার হাজার ভক্তের কাছে তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে।

সমাধির প্রবেশদ্বারগুলির সাথে সংযুক্ত দুটি শিলালিপি থেকে বোঝা যায় যে, প্রবেশদ্বারগুলি ১৬শ শতাব্দীতে সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ্ এবং নাসিরউদ্দিন নসরত শাহ্ কর্তৃক সমাধি সংরক্ষিত হয়েছিল। প্রতি বছর শাওয়াল মাসের ১ ও ২ তারিখ তাঁর উরস পালন করা হয়। এই উরসের সময় জাহানিয়ান জাহাঙ্গশতের পতাকা (যা জালাল উদ্দিন তাবরিজীর দরগায় রাখা আছে) এবং নূর কুতুব আলমের হাতের ছাপ সিরাজের সমাধিতে নিয়ে যাওয়া হয়।৯ এই উরস শুধুমাত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠানই নয় বরং এটি সামাজিক সংযোগ এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বিনিময়ের একটি উৎসব হয়ে দাঁড়ায়।

উত্তরসূরী : শায়খ আঁখি সিরাজ (রহ.) ইন্তিকাল করলে তাঁর উত্তরসূরী হিসেবে স্থলাভিষিক্ত হন আলাউল হক পান্ডভী। ইনি সম্পর্কে আঁখি সিরাজ (রহ.)-এর জামাতা এবং প্রথমদিকের শিষ্য ছিলেন। আঁখি সিরাজ যখন বাংলার পাণ্ডুয়াতে এসেছিলেন তখনই আলাউল হক তাঁর শিষ্য হয়ে গেছেন। পীরের প্রতি আলাউল হকের ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ পেত যখন আঁখি সিরাজ কোথাও ভ্রমণে যেতেন আলাউল হক মাথায় খাবারের গরম কড়াই নিয়ে সঙ্গে যেতেন, যাতে তাঁর পীর চাওয়া মাত্র গরম খাবার পরিবেশন করতে পারেন। এর কারণে আলাউল হকের মাথার চুল পুড়ে যায়, তবুও বিন্দুমাত্র অভিযোগ ছিল না।১০ আঁখি সিরাজের যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে আলাউল হক তাঁর আদর্শ ও শিক্ষার ধারাবাহিকতা বজায় রাখেন। আঁখি সিরাজের জীবন ও কাজ বাংলার সুফি ঐতিহ্যের ভিত্তি স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

তথ্যসূত্র :

1. Banglapedia: National Encyclopedia of Bangladesh Vol-1 page : 162, 2012
2. Haque, Enamul. A History of Sufism in Bengal. Dhaka : Asiatic Society of Bangladesh, 1974, pp. 168–169
৩. দেহলভী, আবদুল হক, আখবার-উল-আখইয়ার পৃ. ১৫১
৪. আশরাফি মিসবাহী, আব্দুল খাবির, আয়নায়ে হিন্দুস্তান: আঁখি সিরাজুদ্দীন উসমান–আহওয়াল ও আসার, হায়দ্রাবাদ : আশরাফিয়া ইসলামিয়া প্রকাশনী, পৃ. ১০১,
৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৪০৪, ২০১৮
6. Haque, Enamul. A History of Sufism in Bengal. Dhaka : Asiatic Society of Bangladesh, 1974, pp. 168–169
7. Rasool, Golam. Chishti-Nizami Sufi Order of Bengal. Delhi, India, p. 83.
8. Lyi`, Avwgi, wmqvi-Dj-AvDwjqv, c",. 289
9. Banglapedia: National Encyclopedia of Bangladesh Vol-1 page : 162, 2012
10. Qamaruddin, Md. ÒProceedings of the Indian History Congress.Ó Vol. 56, 1995, p. 473.

আল-কোরআনের বাণী

“আসলে যারা বিশ্বাসী হয়ে সৎকর্ম করে, পরিণামে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করেন। আল্লাহ্ সত্য অস্বীকারকারীদের অপছন্দ করেন”

–(সূরা রুম : ৪৫)।

আউলিয়া বাণী

“প্রত্যেক আমলের ইমাম হচ্ছে ইলম (জ্ঞান)। আর প্রত্যেক ইলমের ইমাম হচ্ছে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ (ইনায়াত)– হযরত আহমদ ইবনে আসিম আল আন্তাকি (রহ.)।”

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সুফি ভাবধারা

♦ মুহাম্মদ জিয়াউল হাসান ♦

চর্যাপদ দিয়ে বাংলা সাহিত্যের শুরু হয়েছে। প্রাচীন যুগের (৬৫০-১২০০ খ্রি.) পুরোটাই চর্যাপদের গানে মুখর ছিলো বাংলা সাহিত্য। তারপর আসে মধ্যযুগ। মধ্যযুগে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সুর, মঙ্গলকবিদের মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণবকবিদের পদাবলিসহ প্রভৃতির বিচিত্র সমাহার দেখা যায়। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনযুগ ও মধ্যযুগের সাহিত্যকর্ম মূলত ধর্মীয় অনুষঙ্গ নিয়ে রচিত হয়েছে। তৎকালীন বাঙালি জনগোষ্ঠী ধর্মীয় নানান বর্ণপ্রথায় বিভক্ত ও সংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল। আর সেই অন্ধকারে আলোর মশাল নিয়ে হাজির হন বাংলার জমিনে সুফি সাধকগণ। সুফিদের চারিত্রিক সৌন্দর্য, উদারতা, সমতা এবং স্রষ্টা ও সর্বজীবে ভালোবাসার দৃষ্টিভঙ্গি বাংলার আপামর জনসাধারণকে ইসলামের স্নিগ্ধরূপকে সহজেই গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। সেই সাথে বাংলা সাহিত্যের আসরে স্থান করে নেয় সুফিবাদ।

মধ্যযুগে (১২০০-১৮০০ খ্রি.) ইসলাম ধর্ম প্রচারের সাথে সাথে সুফিবাদের প্রসার এবং সুফিতত্ত্ব নিয়ে সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াস স্বভাবপ্রসূত বলেই মনে হয়। সুফিরা প্রেম রাজ্যের অধিবাসী। তাঁরা স্রষ্টা ও সৃষ্টির প্রতি এক গভীর প্রেম অনুভব করেন। সুফিদের ধ্যানস্থ কল্পনা যেন কবিদেরই কল্পনার সমার্থক। পশ্চিমবঙ্গের কবি রণজিৎ দাশ এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'এটা তো প্রায় অলঙ্ঘনীয় কথা যে সুফি ভাবধারার দ্বারা কোনো না কোনোভাবে প্রাণিত না হলে কবিতাই লেখা বোধ হয় সম্ভব নয়। ফলে আমি মনে করি, এমনকি আধুনিকতম কবি পর্যন্ত সকলের কবিতাতেই সুফির একটা টাচ পাওয়া যাবে। কারণ, সুফি দর্শনের মূল ভিত্তি ব্যক্তিমানুষের ধ্যানস্থ কল্পনা। কাব্য সৃষ্টির মূল ভিত্তিও তাই। তদুপরি মিল রয়েছে আশেক-মাশুকের মিলনতত্ত্বে। যে কারণে সুফিমর্মের একমাত্র প্রবক্তা সুফি কবিরা। অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি, সুফি সাধনার মতো কাব্য রচনাও একটি মিস্টিক প্রক্রিয়া, একেবারেই ভাবকল্পনার টেকনিক্যাল অর্থে। তাই আজকাল আমি ভাবি যে কবিতা মানেই সুফি কবিতা।'

প্রাচীনযুগ ও মধ্যযুগের প্রধান প্রধান সাহিত্যধারার সাথে পরোক্ষভাবে সুফিবাদের অন্তর্নিহিত মৌল বিষয়ের সাথে সাদৃশ্য দেখতে পাই, যদিওবা বিষয়বস্তু ভিন্ন।

চর্যাপদের গান বা কবিতাগুলো বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের দ্বারা রচিত হয়েছে। এই সাধকদের উদ্দেশ্য– জাগতিক সকল জরামরণ থেকে মহাসুখরূপ নির্বাণ লাভ। এই মহাসুখরূপ নির্বাণ লাভের জন্য কোনটি আচরণীয় আর কোনটি আচরণীয় নয় তা প্রতিপাদন করাই চর্যাপদের লক্ষ্য। চর্যার ০৫নং পদে কবি চাটিল্ল পা বলেন,

'ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই।
পারগামি লোঅ নিভর তরই।।'

অর্থাৎ পারগামী লোক যাতে নির্ভয়ে তরিতে পারে ধর্মের খাতিরে চাটিল (সাধক কবি) সাঁকো গড়েন। যেমনটা মানুষের পার্থিব ও পরকালীন অনিঃশেষ কল্যাণের জন্য সুফিরা ধর্মের বিভিন্ন সহজ পন্থা সৃজন করেন।

০৯নং চর্যায় কবি কাহ্নপা বলেন,

'তুলো ডোম্বী হাউঁ কপালী।
তোহোর অন্তরে মোএ ঘলিলি হাড়েরি মালী।।'

অর্থাৎ কবি এখানে প্রিয়তমার জন্য কপালী তথা সন্ন্যাসী হয়ে গলায় হাড়ের মালা পরেছেন। এখানে দৃশ্যপট যদিও ভিন্ন, তবুও সুফি মতাদর্শী পীর-ফকিরদের কল্পনা করলে মন্দ নয়। এই পীর-ফকিররাও প্রিয়তমা তথা প্রেমাস্পদ আল্লাহ্‌কে পেতে কতই না কঠোর সংযম সাধনার মধ্য দিয়ে যান। এভাবে চর্যা থেকে বহু উদ্ধৃতি দেওয়া যায়।

মধ্যযুগের শুরুতে বাংলা সাহিত্যে প্রায় দেড়শ বছর (১২০০-১৩৫০ খ্রি.) উল্লেখযোগ্য তেমন সাহিত্যকর্ম সৃষ্টি হয়নি বলে এই সময়কে অন্ধকার যুগ বলা হয়। তবে কিছু অপরিণত সাহিত্যকর্মের দেখা মেলে। তন্মধ্যে অন্যতম হলো রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি হলায়ূধ মিশ্র রচিত 'সেক শুভোদয়া'। গ্রন্থটিতে রাজার পাশাপাশি হযরত শেখ জালালুদ্দীন তাবরেজির অলৌকিক কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে। ঐতিহাসিক মাহবুবুল আলমের মতে, 'হিন্দু কবির দৃষ্টিতে পীর-দরবেশগণের ওপর জাগ্রত দেবমাহাত্ম্য আরোপিত হয়েছে'।

মধ্যযুগের আদি নিদর্শন কবি বড়ু চণ্ডীদাস (চৌদ্দ শতক) রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমলীলা যেন

ভক্ত ও ভগবানের প্রেমলীলা। কাব্যে দেখতে পাই, শ্রীকৃষ্ণের বাঁশির সুরে রাধার মনপ্রাণ আকুল হয়ে যায়। রাধা কৃষ্ণের প্রতি নিজেকে সমর্পণ করতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। কৃষ্ণের ষোলো শ গোপিনী, তার শঙ্কা এই– পাছে সে বাদ পড়ে। কাব্যের এই রাধাকৃষ্ণ সুফিবাদের আশেক-মাশুকের প্রতিনিধিত্ব করে। মাশুক এক– অগণিত আশেকের ভিড়ে সে কীভাবে মাশুকের নিকট গৃহীত হবে সেই উৎকণ্ঠা থেকে আশেক তথা সুফির কঠোর সংযমের সাধনা। 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে' কৃষ্ণের বাঁশির সুরে রাধার মনের বিচিত্র প্রেমানুভূতি যেন সুফিবাদে দীক্ষিত ভক্তহৃদয়ের চির আকুতি–

'কে না বাঁশী বা– বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা।।'

মঙ্গলকাব্য মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এক বিস্তৃত ধারা। এই কাব্যের নামকরণের পেছনে অনেক কারণ বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে প্রসিদ্ধ একটি মত হলো, এই কাব্য শ্রোতার জন্য অশেষ কল্যাণ বা মঙ্গল রয়েছে বিধায় এমন নামকরণ। এই কাব্যের অনেকগুলো শ্রেণির মধ্যে চণ্ডীমঙ্গল অন্যতম। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারার শ্রেষ্ঠ কবি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কাব্যে মুসলমান জীবনের বর্ণনায় পীরের প্রসঙ্গ দেখতে পাই এভাবে,

'ফজর সময়ে উঠি বিছ্যায়া লোহিত পাটী
পাঁচ বেরি করয়ে নমায।
সোলেমানি মালা ধরে জপে পীর পেগাম্বরে
পীরের মোকামে দেই সাঁজ।'

সেই ষোলো শতকে একজন হিন্দু কবির কাছে মুসলমান সমাজে পীর গ্রহণের বিষয়টি দৃষ্টিগোচর হয়েছিলো। তাই বুঝা যায়, তখন থেকেই সুফিবাদের স্নিগ্ধ রূপ দ্বারা বঙ্গদেশ প্লাবিত হয়েছিল।

মধ্যযুগে শ্রীচৈতন্যদেবের (১৪৮৬-১৫৩৩ খ্রি.) আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। তাঁর ওপর সুফিবাদের প্রভাব নিশ্চিতভাবে পড়েছিল, তা না হলে মধ্যযুগের জাতপাত দ্বারা বিভাজিত হিন্দু সমাজে তিনি কীভাবে সকল মানুষকে এক কাতারে আসার আহ্বান জানাতে পারেন। তাঁর আহ্বানে খোলা আকাশের নিচে ব্রাহ্মণ-শূদ্র, হিন্দু-মুসলমান, ধনী-দরিদ্র সকলেই নিঃসঙ্কোচে একত্রিত হয়েছিলো। তিনি বলেন, 'মুচি হয়ে শুচি হয়, যদি কৃষ্ণ ভজে'। তিনি প্রচার করেন প্রেমের ধর্ম– বৈষ্ণব ধর্ম। তাঁকে কেন্দ্র করে কৃষ্ণপ্রেমকে উপজীব্য করে বৈষ্ণব কবিরা রচনা করেন বৈষ্ণব কবিতা। এই কবিগণের মধ্যে কেবল হিন্দুরা ছিলো না, সুফি মতবাদী বাঙালি মুসলমান কবিও ছিলো। বৈষ্ণব কবিতা পর্যালোচনার আলোকে অধ্যাপক মাহবুবুল আলমের ব্যক্তিগত অভিমত হচ্ছে, 'সুফি মতাসক্ত বাঙালি মুসলমানকে বৈষ্ণব সাধনা অনুপ্রাণিত করেছিল বলে জীবাত্মা-পরমাত্মার রূপক রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার ছত্রচ্ছায়ায় মুসলমান কবি জগৎ ও জীবন এবং আত্মা-পরমাত্মার রহস্য উদঘাটনে তৎপর হয়েছেন। তাঁরা বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নেননি, মরমী সাধক ও সুফিপন্থী হিসেবে তাঁরা হৃদয়ানুভূতি প্রকাশে রাধাকৃষ্ণের রূপক অবলম্বন করেছিলেন।'

বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস যখন লিখেন,

'বঁধু কি আর বলিব আমি
মরণে জীবনে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি।'

এই যে অপার্থিব আত্মনিবেদন, যা সুফিদের বিনয়াবনত রূপ উপস্থাপন করে। সুফিবাদ দ্বারা বাংলাভূমি উর্বর হয়েছিল বলেই সেই যুগে এই সাহসী কবি উচ্চারণ করেন,

'শুনহ্ মানুষ ভাই–
সবার উপরে মানুষ সত্য,
তাহার উপরে নাই।'

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যধারায় রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান হিসেবে চিহ্নিত ইউসুফ-জোলেখা ও লায়লী-মজনু কাব্যের সাথে সুফিবাদের মর্মকথার সাদৃশ্য দেখতে পাই। সুফিবাদের মাশুক-আশেকতত্ত্ব এই ধারার কাব্যে খুব সহজেই পরিস্ফুটিত হয়েছে। 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্যের বিষয়বস্তু ইউসুফ ও জোলেখার প্রণয়কাহিনি। পবিত্র কোরআন শরিফ ও বাইবেলে এই কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। সংক্ষেপে কাহিনি এই– "তৈমুস বাদশাহের কন্যা জোলেখা আজিজ মিসরের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেও ক্রীতদাস ইউসুফের প্রতি গভীরভাবে প্রণয়াসক্ত হন। বহু ঘটনার পরে পরবর্তীতে ইউসুফ আল্লাহ্‌র মনোনীত নবি ও মিসরের সম্রাট হন। আর জোলেখা তখনও তাঁর প্রেমাস্পদের আশা পরিত্যাগ করেনি এবং সে সময় ইউসুফ (আ.)-এর মনেরও পরিবর্তন হয়। ফলে উভয়ের মিলন হয়।" বাংলা সাহিত্যে এই প্রণয়োপাখ্যানের রচয়িতা শাহ্ মুহম্মদ সগীর (পনেরো শতক) ইরানীয় সুফি কবিদের রূপককে পল্লবিত করেছেন

এভাবে– ইউসুফ 'মাশুক' আর জোলেখা 'আশেক'; ইউসুফের রূপের প্রতি জোলেখার আকাঙ্ক্ষা আশেকের মাশুকের সাথে মিলন কামনারই নামান্তর।

আরবি লোকগাঁথার এক অমূল্য সম্পদ লায়লী-মজনুর প্রণয়কাহিনি। এই প্রণয়কাহিনিকে উপজীব্য করে ষোড়শ শতকের বাঙালি মুসলিম কবি দৌলত উজির বাহরাম খান রচনা করেন 'লায়লী-মজনু' কাব্য। কাব্যের কাহিনি হলো– "আমির পুত্র কায়েস বাল্যকালে বণিককন্যা লায়লীর প্রেমে পড়ে মজনু (পাগল) নামে খ্যাত হয়। লায়লীও মজনুর প্রতি গভীর প্রেম অনুভব করে। কিন্তু তাদের বিবাহে আসে প্রবল বাধা। ফলে মজনু পাগলপ্রায় হয়ে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। অন্যদিকে লায়লীর অন্যত্র বিবাহ হলেও তার মন থেকে তখনও মজনুর স্মৃতি বিলীন হয়নি। অবশেষে করুণ মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তাদের দীর্ঘ বিরহজীবনের অবসান ঘটে।" কবি বাহরাম খানের এই কাব্যটি ছিলো মূলত পারসিক সুফিকবি আল্লামা জামীর কাব্যের ভাবানুবাদ। তাই বলতে পারি সুফিবাদে স্রষ্টার জন্য সৃষ্টির যে আকুলতা সেই প্রেমাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই কবি এই কাব্য রচনা করেছেন। তাছাড়া আদিরসাত্মক প্রেমের কবিতা হয়েও এতে অশ্লীলতার কোনো স্থান নেই দেখে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মন্তব্য করেন, 'লায়লী-মজনু আদিরসাত্মক কাব্য। কিন্তু অন্তর্নিহিত সুফিভাবের জন্য কোন স্থানে অশ্লীলতা নেই'।

বাউলগানে সুফিবাদ অবিচ্ছেদ্য এক গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসেবে মিশে আছে। সুফিমতের প্রত্যক্ষ সংযোগেই বাউল মতের উদ্ভব হয়। বাউল মত নিয়ে মুহম্মদ আবদুল হাই ও ড. আহমদ শরীফ সম্পাদিত 'মধ্যযুগের বাঙলা গীতিকবিতা' গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে যে, 'সেদিন নির্যাতিত নিম্ন শ্রেণির বঞ্চিত মনে ইসলামের সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও মৈত্রী অধিকারবোধের যে উত্তেজনা এবং মুক্তির যে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়েছিল, তারই ফলে মন্দির ছেড়ে মসজিদের পথে না গিয়ে উদার আকাশের তলে স্রষ্টার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক পাতাবার এ নতুনতর প্রয়াসমাত্র'। মানুষের মাঝে স্রষ্টার উপস্থিতি জ্ঞান করে বাউল কবি লিখেন,

লামে আলিফ লুকায় যেমন
'মানুষে সাঁই আছে তেমন
তা না হলে কি সব নুরের তন
আদম তনকে সিজদা জানায়।'

বাউলরা তাঁদের সঙ্গীত সাধনায় স্রষ্টাকে সাঁই, মনের মানুষ কিংবা অচিন পাখি অভিধায় চিহ্নিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। সুফি মতানুসারে, মানুষের হৃদয়আত্মায় পরমাত্মা তথা স্রষ্টার অবস্থান। তাই হৃদপিঞ্জরে নিত্য আসা-যাওয়া করা পরম প্রভুকে চিরকালের করে ধরে রাখার জন্য বাউলসম্রাট লালনের পুণ্যমনস্কামনা–

'খাঁচার ভিতর অচিন পাখী কেমনে আসে যায়
তারে ধরতে পারলে মন-বেড়ী দিতাম তাহার পায়।'

মধ্যযুগে হিন্দু-মুসলমান সমাজে ধর্মীয় অনুশাসনের যে কাঠিন্য ছিল তা শিথিলতা লাভ করেছিল হিন্দুদের ভক্তিবাদ ও মুসলমানদের সুফিবাদের প্রভাবে। আর তাই দেখি সত্যপীরের অনুষঙ্গ বাংলায় এক সাংস্কৃতিক ঐক্যের জন্ম দেয়। মধ্যযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর (আঠারো শতক) বলেন, 'এক ফকির জনৈক ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হয়ে ফকিরের নামে শিরনি দিতে বলেন। ব্রাহ্মণ অস্বীকার করায় ফকির অদৃশ্য হয়ে যান এবং হিন্দু ঈশ্বর হরিরূপ ধারণ করে পুনরায় উপস্থিত হন। অতঃপর আবার অদৃশ্য হয়ে যান। হিন্দু ভগবান হরি এবং মুসলমান ফকির প্রকৃতপক্ষে আধ্যাত্মিকভাবে এক ও অভিন্ন– পরে এ সত্য উপলব্ধি করে ব্রাহ্মণ সত্যপীরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে এবং তাঁর নামে শিরনি দেয়।'

পরিশেষে বলা যায়, সুফিবাদের সংস্পর্শে এসে বাঙালির সাধারণ্যে যাপিত জীবন ও সংস্কৃতিতে যেমন পরিবর্তন এসেছিলো, ঠিক তেমনি কবিত্বশক্তি থাকা কবিকে সুফিবাদের প্রেম ও উদারতা প্রভাবিত করেছিলো।

বি. দ্র. উপর্যুক্ত নিবন্ধ মূলত বাংলা সাহিত্যে সুফি চর্চা বিষয়ক তথ্যভিত্তিক উপস্থাপনা। বেদ-উপনিষদের অনুসারী মুনি-ঋষিরা যে দৃষ্টিতে ইসলাম ধর্ম অনুশীলনে তৎপর সুফি সাধকদের পর্যবেক্ষণ করেছেন এর বিবরণ বৈষ্ণব কবিদের মাধ্যমে নিবন্ধে এসেছে। তবে ইসলাম ধর্মে অনুশীলিত তাসাওউফ তথা সুফিচারিতা প্রথম মানব এবং নবি হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু হয়েছে। পৃথিবীতে হযরত আদম (আ.)'র প্রত্যাবর্তন পরবর্তী নিঃসঙ্গ অবস্থায় পরিভ্রমণের মাধ্যমে এ ধারার সূত্রপাত ঘটেছে।

আত্ম পরিচয় দর্শন: অলি, দার্শনিক এবং কবির বাণীতে ঐক্যের ঝংকার

♦ মোহাম্মদ আরমান উদ্দীন ♦

১. মহান আল্লাহ্‌র পরম নৈকট্যপ্রাপ্ত দরবেশ বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) বলেন:

"নিজের ভিতর দৃষ্টি দাও বহির্জগতের চাইতেও অপরূপ সুন্দর দৃশ্যাবলি দেখতে পাবে।"

২. বিশ্বখ্যাত দার্শনিক সক্রেটিস বলেন:

"Know Thyself –নিজেকে জানো।"

৩. বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম উল্লেখ করেছেন: "যে আত্মাকে চিনে সে আত্মনির্ভরশীল হয়।"

পৃথিবীতে আগমনের সময় থেকে ঐশী বিরহ বেদনায় আত্মমগ্ন মানুষ স্বীয় অন্তর্জগত বিষয়ে অনন্ত প্রশ্নে তন্ময়-বিভোর থেকেছে বার বার। কেন পৃথিবীতে আসা হলো, আবার কেনই বা পৃথিবীর মায়া মমতা ছিন্ন করে যেতে হবে পরপারে, অচেনা প্রান্তরে, সেখানে আবারো অবস্থান হবে অনন্তকালের। কেনই বা অনন্ত জগতের পরম প্রেমময় নৈকট্য থেকে ধরণী তটে আদম সন্তানের বিচরণ; এ নিয়ে সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই মানুষ নিজেকে জানার চেষ্টা করে আসছে। "আমি কে?" আমার অস্তিত্বের উদ্দেশ্য কী? এবং প্রশ্নগুলো মানব সভ্যতার চিন্তাধারাকে পরিচালিত করে চলছে অনবরত। আল্লাহ্‌র অলি, দার্শনিক ও কবিরা নিজ নিজ চৈতন্য থেকে এই আত্মপরিচয়ের সত্যকে ব্যাখ্যা করেছেন। বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.), দার্শনিক সক্রেটিস এবং কবি কাজী নজরুল ইসলামের বাণী– তিনটি ভিন্ন যুগ ও প্রেক্ষাপটের হলেও মূল বক্তব্যে সুগভীর ঐক্য লক্ষ্য করা যায়।

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) বলেন, নিজের ভিতর দৃষ্টি দাও, বহির্জগতের চাইতেও অপরূপ সুন্দর দৃশ্যাবলি দেখিতে পাবে। এই বাণীর মাধ্যমে তিনি মানুষকে বাহ্যিক জগতের মোহ ত্যাগ করে অন্তর্জগতের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তাসাওউফের ভাষায় একে বলা হয় আত্মদর্শন বা মোরাকাবা। মানুষের অন্তর যখন পরিশুদ্ধ হয়, তখন সে আল্লাহ্‌র নূর ও মারিফাত উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। কোরআন মাজিদে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, "সময় হলেই আমি আমার মহিমার নিদর্শনসমূহ বহির্জগতে ও তাদের অন্তর্জগতে প্রদর্শন করব" –(সূরা হা-মিম সেজদা : ৫৩)। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নিদর্শন শুধু বাইরের জগতে নয়, মানুষের নিজের অন্তর্জগতের অস্তিত্বের মধ্যেও বিদ্যমান। হাদিস শরিফে আছে– জেনে রেখো, দেহে একটি গোশ্‌তের টুকরো আছে– তা ঠিক হলে পুরো দেহ ঠিক হয়, আর তা নষ্ট হলে পুরো দেহ নষ্ট হয় তা হলো হৃদয়" –(বুখারি ও মুসলিম)। অলিদের শিক্ষা হলো– যে ব্যক্তি নিজের অন্তর শুদ্ধ করে, সে আল্লাহ্‌র নূর, রহস্য ও মারিফাত উপলব্ধি করতে পারে। এটাই অপরূপ সুন্দর দৃশ্য।

প্রাচীন গ্রিসের বিশ্ববিশ্রুত দার্শনিক সক্রেটিসের বিখ্যাত উক্তি, Know Thyself (নিজেকে জানো)। মানব চিন্তার ইতিহাসে আত্মচেতনার এক মৌলিক দর্শন। সক্রেটিসের মতে, আত্মপরিচয় ছাড়া জ্ঞান অসম্পূর্ণ। ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে এই আত্ম পরিচয় মানুষকে নিজের সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতা উপলব্ধি করায়, যা শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র মহত্ত্ব স্বীকার করে। কোরআনে বলা হয়েছে "হে মানুষ, তোমরা আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষী" –(সূরা ফাতির : ১৫)। অতএব, নিজেকে জানা মানেই নিজের দীনতা এবং সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করা এবং স্রষ্টার দিকে প্রত্যাবর্তন করা।

বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেন, "যে আত্মাকে চিনে, সে আত্মনির্ভরশীল হয়।" নজরুলের এই বাণী আত্মমর্যাদা ও আত্মচেতনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। আত্মাকে চেনা মানে নিজের শক্তি, দায়িত্ব ও লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া– সেটা মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার অনুশীলন প্রক্রিয়ার দার্শনিক নির্দেশনা উসুলে সাবয়ার অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য বটে।

কোরআনে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে –(সূরা রাদ : ১১)। আত্মচেতনা মানুষকে পরনির্ভরতা থেকে মুক্ত করে আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভরশীল হতে শেখায়, যা প্রকৃত আত্মনির্ভরশীলতা।

এই তিনটি বাণী গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, মূল বক্তব্য একটিই– মানুষকে নিজের ভেতরের দিকে ফিরে যেতে হবে। পার্থক্য শুধু দৃষ্টিভঙ্গিতে। বিশ্বঅলি দেখেছেন তাসাওউফ ও মারিফাতের আলোকে, সক্রেটিস বিষয়টিকে দেখেছেন দর্শনের আলোকে, আর কবি দেখেছেন মানবিক ও সামাজিক চেতনা নির্ভর আত্ম প্রশ্নের আলোকে। এই তিনটি বাণী অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও ভাবগত মাত্রায় ভিন্নতা রয়েছে। অলিদের বক্তব্য কেবল চিন্তা বা চেতনায় সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা মানুষকে সরাসরি আল্লাহ্‌র নৈকট্যের পথে পরিচালিত করে। বিশ্ববিশ্রুত একজন অলি হিসেবে শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র বাণী এ অর্থে আত্মার বিকাশ এবং প্রসারণের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত। কর্মক্ষেত্রে বিষয়টি প্রমাণ করতে হয় যে, মানুষের অন্তর্জগত কতোইনা সুন্দর, পরিশীলিত এবং মার্জিত, পরহিতকর এবং সুষমামণ্ডিত। কোরআনের ঘোষণা– নিশ্চয়ই সফল সে ব্যক্তি, যে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে –(সূরা শামস : ৯)। এই আত্মাই সত্যকে সুস্পষ্ট করে।

অবশেষে বলা যায় আত্ম পরিচয় মানবজীবনের মূল চাবিকাঠি। যে ব্যক্তি নিজের অন্তরকে চিনে ও উপলব্ধি করে, সে সত্য, প্রকৃত স্বাধীনতা ও আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করে। অলি, দার্শনিক ও কবির বাণী সেই একই সত্যের দিকে মানুষকে আহ্বান জানায়। মানুষের বিশ্বাস ও চিন্তার মানদণ্ড অনুযায়ী তা প্রভাব বিস্তার করে থাকে। তবে আল্লাহ্‌র অলিদের বাণীই মানুষকে চূড়ান্ত হেদায়েতের পথে পৌঁছে দেয়।

তাযকিয়া-এ-নফ্‌স'র পরিপূর্ণ রূপ : নফ্‌সে জাকিয়া

♦ শেখ বিবি কাউছার ♦

আজ সমগ্র মানবতা এক গভীর সমস্যার সম্মুখীন। আর তা হলো উত্তম আখলাক। বর্তমান সময়ে মানুষ অনেক বেশি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন করছে কিন্তু সেই শিক্ষা মানুষের ভেতর যে সুকুমার বৃত্তি রয়েছে সেটিকে জাগিয়ে তুলতে পারছে না। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এমনকি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও আজ সকলেই অনেক বড় সমস্যার সম্মুখীন। আখলাক বা উত্তম চরিত্রের সংকটের কারণে যেমন মানবতা আজ সবচেয়ে বেশি অধঃপতনের মধ্যে নিমজ্জিত ঠিক তেমনি মূল্যবোধের সংকটেও নিমজ্জিত। মানুষ উত্তম চরিত্র ও মূল্যবোধের অধিকারী তখনই হতে পারে যখন সে নিজের নফ্‌সকে নিয়ন্ত্রন করতে পারে। যেমন, মহান আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকে চোখ, কান, জিহ্বা, ত্বক দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের জন্য চোখ এক অনুপম দান। চোখকে যদি মানুষ ভালো কাজে ব্যবহার করে তাহলে ভালো কিছু সিদ্ধ হয়, আর খারাপ কাজে ব্যবহার করলে কু-প্রবৃত্তিই বিকশিত হয়। এতে মানুষের ধ্বংস অনিবার্য। মহান আল্লাহ্ বলেন, "শপথ নফ্‌সের এবং তাঁর, যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন। অতঃপর তাকে তার পাপ ও তাকওয়া (সচেতনতা) শিক্ষা দিয়েছেন। নিশ্চয়ই সফলকাম হয়েছে সে, যে তা (নফ্‌স) পরিশুদ্ধ করেছে। আর সে-ই ব্যর্থ হয়েছে, যে তা কলুষিত করেছে" -(সূরা শামস : ৭-১০)। এই আয়াত থেকে বুঝা যায়, পৃথিবীতে পবিত্র আত্মার মানুষই সফলকাম এবং কলুষিত আত্মার মানুষ সর্বদা ব্যর্থকাম। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের চেহারা বা মালের দিকে দেখেন না। বরং তিনি দেখেন তোমাদের অন্তর ও আমলের দিকে।"

মানুষ সামাজিক জীব। বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ মানুষের সহজাত। কিন্তু মনের সকল সত্তায়, সকল সময়ে এ ধরনের মনোভাব জাগিয়ে রাখা অপবিত্রতা। এগুলো মানুষকে অস্থির করে রাখে, বিপদগামী করে, হৃদয়ে অপবিত্রতা নিয়ে আসে। এ গুলোর অবসানেই মানুষ পবিত্র হয়। এগুলো দূর হলেই শুদ্ধতা আসে। ভেতরের পশুত্বকে শাসন করে নিয়ন্ত্রণে আনার মাঝেই মানুষের সার্থকতা। সকল অন্যায় থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আল্লাহ্ ও রাসুল (দ.)-এর সন্তুষ্টির জন্য সৎপথে সৎকর্মের চর্চা ও নিবেদিত প্রার্থনার মাধ্যমে পবিত্রতা আসে।

মানুষ হলো বিকাশমান এক সত্তা। তাই নিজেকে বিকশিত করার জন্য যেকোন মানুষকে মহৎ মানুষের সোহবতে থাকতে হয়। আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন, "মানুষ সেই কাজেরই ফল পাবে, যার জন্যে সে প্রাণান্ত প্রয়াস চালাবে" -(সূরা নজম : ৩৯)। বিষয়টি নফ্‌সের সঙ্গে সম্পর্কিত। নফ্‌স আরবি শব্দ। যার অর্থ আত্মসত্তা। নফ্‌স হলো মানুষের ভেতরের কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ, মাৎসর্য প্রবৃত্তিগুলোর কেন্দ্রস্থল। অনেকেই এটিকে অহম বা ইগো বলে অভিহিত করে। মানুষের নফ্‌সের প্রকাশ্য দিক হলো তার লোভ-লালসা। এটি মানুষের নানা অঙ্গে ছড়িয়ে আছে। মানুষের ইন্দ্রিয়গুলো নফ্‌সের সেবায় যেন সর্বক্ষণ নিয়োজিত। তাই মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন নফ্‌সের বিরোধিতা করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং যারা নফ্‌সের বিপরীতে কাজ করেছেন, তাদের তিনি প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ্ বলেন, "যে প্রবৃত্তি হতে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত রাখে, নিশ্চয়ই জান্নাতই হবে তার আবাসস্থান" -(সূরা নাযিয়াত : ৪০-৪১)। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আল্লাহ্ তা'য়ালা যখন তাঁর কোনো বান্দার কল্যাণের ইচ্ছা করেন, তখন তিনি তাঁর দৃষ্টিশক্তি খুলে দেন, যাতে সে তার নফ্‌সের দোষ-ত্রুটি দেখতে পায়।" তিনি আরও বলেন, "যে নিজেকে (নফ্‌স) চিনেছে, সে তার রবকে চিনেছে।" তাই নফ্‌সকে নিয়ন্ত্রণের জন্য মানুষকে সাধনা করতে হয়। কারণ সাধনা ব্যতীত আত্মশুদ্ধিতা আনয়ন কঠিন কাজ। পবিত্র কোরআনে তিন প্রকার নফ্‌সের কথা উল্লেখ আছে:

নফ্‌সে আম্মারা: নফ্‌সে আম্মারা বলতে মানুষের সেই প্রবৃত্তিমূলক ইচ্ছাশক্তিকে বোঝায়, যা তাকে মন্দ কাজের দিকে প্ররোচিত করে। কোরআনে এ সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ আছে: "নিশ্চয়ই নফ্‌স মানুষকে মন্দের দিকে প্রবলভাবে আদেশ করে" -(সূরা ইউসুফ : ৫৩)। যার মধ্যে নফ্‌স প্রবল, তার কাছে পার্থিব সুখ ও আনন্দই মুখ্য। এই সুখ ও আনন্দের জন্য নীতি নৈতিকতার প্রশ্ন তার কাছে অবান্তর। এটি আত্মাশুদ্ধির পথে সবচেয়ে বড় বাধা। তাই সুফিগণ মুজাহাদা (আত্মসংযম) ও রিয়াযতের মাধ্যমে নফ্‌সে আম্মারাকে নিয়ন্ত্রণের উপদেশ দেন।

নফ্‌সে লাওয়ামা (সংগ্রামরত): নফ্‌সে লাওয়ামা অর্থ অনুতপ্ত ও আত্মসমালোচনাকারী আত্মা। কোরআনে আল্লাহ্ বলেন "আমি শপথ করছি তিরস্কারকারী আত্মার" –(সূরা আল-কিয়ামাহ : ২)। এটি এমন নফ্‌স, যে শুদ্ধ হতে আগ্রহী, শুদ্ধ হওয়ার সাধনায় নিয়োজিত। এমন নফ্‌সের অধিকারী যদি কোন দুর্বল মুহূর্তে কোন অন্যায় বা ত্রুটি করে ফেলে, তবে নিজের ভেতরের অনুশোচনায় নিজেই দগ্ধ হতে থাকে, নিজেকে নিজে ভর্ৎসনা বা তিরস্কার করে। এ কারণে কেউ কেউ এই নফ্‌সের নাম দিয়েছেন তিরস্কারকারী নফ্‌স, অনুতাপকারী নফ্‌স বা ভর্ৎসনাকারী নফ্‌স। সুফি সাধক বা কোন পুণ্যবান ব্যক্তির আশ্রয়-নির্দেশে, শিক্ষায়-প্রেমে, অবিরাম সাধনায় থেকে এ নফ্‌স শুদ্ধির জন্য মানুষ চেষ্টা করে যাচ্ছে। দীর্ঘদিনের অভ্যাস, চাহিদা, দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সে মুক্ত হতে চায়। আগের শিকল সম্পূর্ণরূপে ভাঙতে পারে না কিন্তু ভাঙতে চেষ্টা করে। সে কোরআনের মর্মার্থ বুঝতে চেষ্টা করে, নামায-রোজার গূঢ় অর্থ অনুসন্ধান করে, দান-খয়রাত করে, সৃষ্টিকে ভালোবাসে; অহংকার, হিংসা, লোভ ইত্যাদি অনেকটাই আর তার মাঝে ক্রিয়াশীল নেই। এ ধরনের নফ্‌সের অধিকারীদের পবিত্র কোরআনে 'আমানু' বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

নফ্‌সে মুতমা'ইন্না (পরিশুদ্ধ আত্মা): মুতমা'ইন্না শব্দের অর্থ শান্ত, বিশ্রাম, শান্তিপূর্ণ ইত্যাদি। এটি সেই উন্নত স্তরের নফ্‌স, যা মন্দ প্রবণতা থেকে মুক্ত হয়ে পুরোপুরি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির দিকে ধাবিত হয়। এই নফ্‌স আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ আস্থা ও সন্তুষ্টি অর্জন করে। এই নফ্‌সের অধিকারী সুখে-দুঃখে সর্ব অবস্থায় আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল থাকে। মূলত নফ্‌স পুরোপুরি শুদ্ধ হয়ে গেলেই মুমিন বা মুতমা'ইন্না। শুদ্ধ নফ্‌স সবসময় আল্লাহ্‌র স্মরণে থাকে বলে প্রশান্ত। নফ্‌সে মুতমা'ইন্নার অধিকারী হন স্বভাবজাতভাবে অহংকারমুক্ত ও বিনয়ী ব্যক্তি। তিনি অন্যের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়ান না। পরচর্চা ও পরনিন্দা থেকে বিরত থাকেন। নিজের কী ত্রুটি আছে তা খোঁজার এবং নিজেকে সংশোধন করার চেষ্টা করেন। কোরআনে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, হে প্রশান্ত চিত্ত! তুমি তোমার রবের কাছে ফিরে এসো সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে, আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও, আর আমার জান্নাতে প্রবেশ করো –(সুরা ফজর : ২৭-৩০)। এটি হলো নফ্‌সে জাকিয়ার স্তর। নফ্‌সে জাকিয়া শুধুমাত্র সাধনাস্তরের সর্বশেষ পর্যায় নয়, বরং এক মহান আধ্যাত্মিক বিপ্লবীর অমর নাম, এক বিরল উপাধি। আহলে বাইতে রাসুল (দ.)'র কোরবানীর এক বিরল অভিধান। ইতিহাসে এটি ধামাচাপা দেয়া আছে।

পরিশেষে বলা যায়, নফ্‌সে আম্মারা থেকে নফ্‌সে মুতমা'ইন্না হলো সাধকের জন্য একটি আধ্যাত্মিক যাত্রা। মাইজভাণ্ডারী দর্শনের 'উসুলে সাবআ' বা সপ্তপদ্ধতির অনুশীলন ও চর্চা পরিশুদ্ধ আত্মা গঠনে অনন্য ভূমিকা রাখে। নৈতিকতার সমাজ গঠনে পরিশুদ্ধ আত্মা বা নফ্‌সে জাকিয়াসম্পন্ন হওয়া মানুষের খুব প্রয়োজন। পরিশুদ্ধ আত্মার মানুষই পারে উত্তম আখলাক ও আধ্যাত্মিক মানুষ তৈরি করতে।

পবিত্র পাঁচজন সম্পর্কে আল কোরআনের বাণী

"আর এই মহা-অনুগ্রহের সুসংবাদ আল্লাহ্ তাঁর বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল বান্দাদের দিচ্ছেন। হে নবি! ওদের বলুন, 'এই সুসংবাদ দেয়ার জন্যে আমি তোমাদের কাছে কোনো পুরস্কার চাই না, আমি শুধু চাই তোমরা পরস্পরকে নিকটাত্মীয়ের মতো (হুজুর দ.-এর পবিত্র রক্তের বন্ধনে সংযুক্তদের বিষয়) ভালোবাসবে'। নিশ্চয় যে ভালো কাজ করে আমি তার জন্যে কল্যাণ বৃদ্ধি করি। আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, মহাগুণগ্রাহী" –(সূরা শুরা : ২৩)।

আউলিয়া বাণী

"আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদের প্রতি বাহ্যিক সম্মান প্রদর্শন আসলে আল্লাহ্‌র প্রতি অভ্যন্তরীণ বিনয়েরই বহিঃপ্রকাশ"
–হযরত আবু হাফস হাদ্দাদ নিশাপুরী (রহ.)।

'এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট'র অর্থায়নে সোয়া দুই কোটি টাকা ব্যয়ে সংস্কার ও আধুনিকায়নকৃত চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের কার্ডিওলজি বিভাগে ২৩ বেডের সিসিইউ' উদ্বোধন করছেন চসিক মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন।

১৪ মার্চ ২০২৬: 'এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট'র উদ্যোগে ৬৬ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ৫৫ লাখ টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠানে চেক তুলে দিচ্ছেন চট্টগ্রাম-০৮ আসনের সম্মানিত সাংসদ জনাব এরশাদ উল্লাহ।

গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী ও ১২০তম মহান ১০ই মাঘ উরস শরিফ উপলক্ষে 'এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট'র ব্যবস্থাপনায় ১০ দিনব্যাপি কর্মসূচির অংশ হিসেবে পালিত অনুষ্ঠানাদির স্থিরচিত্র।

অষ্টাদশ শিশু-কিশোর সমাবেশ-২০২৬

'শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) বৃত্তি তহবিল' আয়োজিত ২০২৫ পর্বের দ্বিতীয় পর্যায়ে ৪৪জন প্রতিবন্ধী ও সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের ২,৮৯০০০ টাকা বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে বৃত্তিপ্রাপ্তদের সম্মিলিত স্থিরচিত্র।

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট-এর নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

০১. মাদ্‌রাসা-ই-গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী, মাইজভাণ্ডার শরিফ, চট্টগ্রাম।
০২. উম্মুল আশেকীন মুনওয়ারা বেগম এতিমখানা ও হিফ্‌যখানা, মাইজভাণ্ডার শরিফ, চট্টগ্রাম।
০৩. উম্মুল আশেকীন সৈয়দা সাজেদা খাতুন হিফ্‌যখানা ও এতিমখানা, নোয়াজিষপুর, রাউজান, চট্টগ্রাম।
০৪. বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী হাফিজিয়া ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা ও এতিমখানা, পশ্চিম গন্ধব্যপুর, হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর।
০৫. নোয়াজিষপুর মূঈনীয়া আজিজিয়া মাদ্‌রাসা, নোয়াজিষপুর, রাউজান, চট্টগ্রাম।
০৬. বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী কমপ্লেক্স, হাটপুকুরিয়া, বটতলী বাজার, বরুড়া, কুমিল্লা।
০৭. গাউসিয়া হক ভাণ্ডারী ইসলামিক ইনস্টিটিউট (দাখিল), পশ্চিম গোমদণ্ডী ৯নং ওয়ার্ড, বোয়ালখালী, পৌরসভা, চট্টগ্রাম।
০৮. শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী উচ্চ বিদ্যালয়, মানিকপুর, কাঞ্চননগর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
০৯. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী বি.এম বালিকা স্কুল এন্ড কলেজ, বীজবাগ, সেনবাগ, নোয়াখালী।
১০. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী সুন্নিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা গোরখানা, মানিকছড়ি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
১১. গাউসিয়া কলন্দরীয়া নঈমীয়া মাদ্‌রাসা হেফজখানা ও এতিমখানা, বেতছড়ি ১নং ওয়ার্ড, ১৩নং ইসলামপুর, ঠাণ্ডাছড়ি, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম।
১২. হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী আতর আলী মহিলা দাখিল মাদ্‌রাসা, বোয়াবিলি, রাজানগর, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম।
১৩. জিয়াউল কুরআন নূরানী একাডেমি, পূর্ব লালানগর, ছোট দারোগার হাট, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।
১৪. মাদ্‌রাসা-ই-শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী হিফ্‌যখানা ও এতিমখানা, হামজারবাগ, বিবিরহাট, চট্টগ্রাম।
১৫. শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ইসলামি একাডেমি, হাইদগাঁও, পটিয়া, চট্টগ্রাম।
১৬. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী ইবতেদায়ী মাদ্‌রাসা, সুয়াবিল, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
১৭. শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) স্কুল মাদ্‌রাসা, শান্তির দ্বীপ, গহিরা, রাউজান, চট্টগ্রাম।
১৮. মাদ্‌রাসা-ই জিয়া মওলা হক ভাণ্ডারী, পশ্চিম ধলই (রেল-লাইন সংলগ্ন), হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
১৯. শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ইসলামি একাডেমি, বীজবাগ, সেনবাগ, নোয়াখালী।
২০. মাদ্‌রাসা-ই-শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী, সৈয়দ কোম্পানী সড়ক, ফরহাদাবাদ, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
২১. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা, পাটিয়ালছড়ি, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
২২. মাদ্‌রাসা-ই-শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী, বৈদ্যেরহাট, ভূজপুর, চট্টগ্রাম।
২৩. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা, ফতেপুর, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
২৪. মাদ্‌রাসা-ই-শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী, খিতাপচর, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
২৫. জিয়াউল কুরআন জামে মসজিদ ও ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা, চরখিজিরপুর (ট্যাঙ্কঘর), বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
২৬. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা, মেহেরআটি, পটিয়া, চট্টগ্রাম।
২৭. জিয়াউল কুরআন সুন্নিয়া ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা, এয়াকুবদণ্ডী, পটিয়া, চট্টগ্রাম।
২৮. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী ফোরকনিয়া মাদ্‌রাসা, চন্দনাইশ(সদর), চট্টগ্রাম।
২৯. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী দায়রা শরিফ ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা, চরখিজিরপুর, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
৩০. শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা, পশ্চিম ধলই (রেললাইন সংলগ্ন), হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্প:

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) বৃত্তি তহবিল

সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা প্রকল্প:

১. হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) দাতব্য চিকিৎসালয়, চকবাজার রোড, দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ।
২. হোসাইনী দাতব্য চিকিৎসালয় ও খত্‌না সেন্টার, মাইজভাণ্ডার শরিফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
৩. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী (ক.) দাতব্য চিকিৎসালয়, আজিমপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
৪. সৈয়দ নুরুল বখ্‌তেয়ার শাহ্ (র.) দাতব্য চিকিৎসালয়, গাউসিয়া হক ভাণ্ডারী খানকাহ্ শরিফ, বিবিরহাট, চট্টগ্রাম।
৫. জামাল আহমদ সিকদার দাতব্য চিকিৎসালয়, পুরাতন পোস্ট অফিস গলি, পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।
৬. হযরত আকবর শাহ্ (র.) দাতব্য চিকিৎসালয়, ইস্পাহানী 'সি' গেইট, আকবর শাহ্, চট্টগ্রাম।
৭. সৈয়দ ছালেকুর রহমান শাহ্ (র.) দাতব্য চিকিৎসালয়, ধামাইরহাট, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম।
৮. সৈয়দ আবদুল গণি কাঞ্চনপুরী (র.) দাতব্য চিকিৎসালয়, কাঞ্চনপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
৯. মাইজভাণ্ডারী দাতব্য চিকিৎসালয়, মানিকছড়ি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
১০. হযরত সৈয়দ জালাল উদ্দিন বোখারী (র.) দাতব্য চিকিৎসালয়, খান প্লাজা, দোহাজারী পৌরসভা, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম।
১১. ছৈয়দুর রহমান আনোয়ারা বেগম দাতব্য চিকিৎসালয়, খিতাপচর, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
১২. শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) দাতব্য চিকিৎসালয়, আগানগর (আনন্দ বাজার), ভৈরব, কিশোরগঞ্জ।
১৩. সৈয়দ রহিম উল্লাহ্ শাহ্ (র.) দাতব্য চিকিৎসালয়, নতুন হাট, নোয়াজিষপুর, রাউজান, চট্টগ্রাম।
১৪. ময়ূরখীল দাতব্য চিকিৎসালয়, ময়ূলখীল, খাগড়াছড়ি।
১৫. হোসাইনী আই কেয়ার সেন্টার, মাইজভাণ্ডার শরিফ, ফটিকছড়ি।

দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থিক সহায়তা প্রকল্প:

- যাকাত ওয়েলফেয়ার ফান্ড • দুস্থ সাহায্য তহবিল

মাইজভাণ্ডারী আদর্শগত গবেষণা ও প্রকাশনা প্রকল্প:

- মাইজভাণ্ডারী একাডেমি • আলোকধারা বুক্‌স প্রকাশনা
- মাসিক আলোকধারা

বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র:

আলোকধারা বুক শপ
সাফ আমিন শপিং মল, দোকান নং-১৮ ও ১৯,
লেভেল-০১, ১৫৮ কলেজ রোড, চকবাজার, চট্টগ্রাম।

আত্মোন্নয়নমূলক যুব সংগঠন: • তাজকিয়া

মহিলাদের আত্মজিজ্ঞাসা ও জ্ঞানানুশীলনমূলক সংগঠন:

- আলোর পথে • দি মেসেজ

বাইত-উল-আসফিয়া মাইজভাণ্ডারী খানকাহ্ শরিফ

খাদেম বাড়ি (৩য় তলা), বাড়ি # ৪, ব্লক # ক, মিরপুর হাউজিং এস্টেট, উত্তর বিশিল, থানা-শাহ্ আলী, মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬।

সংগীত ও সংস্কৃতি চর্চা প্রকল্প:

- মাইজভাণ্ডারী মরমী গোষ্ঠী

জনসেবা প্রকল্প:

- দৃষ্টিনন্দন যাত্রীছাউনী ও ইবাদতখানা, নাজিরহাট তেমুহনী রাস্তার মাথা।
- দৃষ্টিনন্দন যাত্রীছাউনী, শান-ই-আহ্‌মদিয়া গেইট সংলগ্ন, মাইজভাণ্ডার শরিফ।

বার্ষিক অনুষ্ঠানসমূহে:

- ন্যায্যমূল্যের হোটেল (মাইজভাণ্ডার শরিফ),
- ভ্রাম্যমাণ ওযুখানা ও টয়লেট।